দাম : বারো টাকা

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে
কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার
এটাই উপযুক্ত সময়
— পৃঃ ১১

স্বস্তিকা

দিল্লি দাঙ্গার নেপথ্য
কুশীলব বামপন্থী এবং
অতিবামপন্থীরা
— পৃঃ ১৫

৭২ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা।। ১৬ মার্চ, ২০২০।। ২ চৈত্র - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com

দিল্লির দাঙ্গা পূর্বপরিকল্পিত

দাঙ্গার সময় কেজরিকে ছ'বার ফোন করেছিলেন তাহির

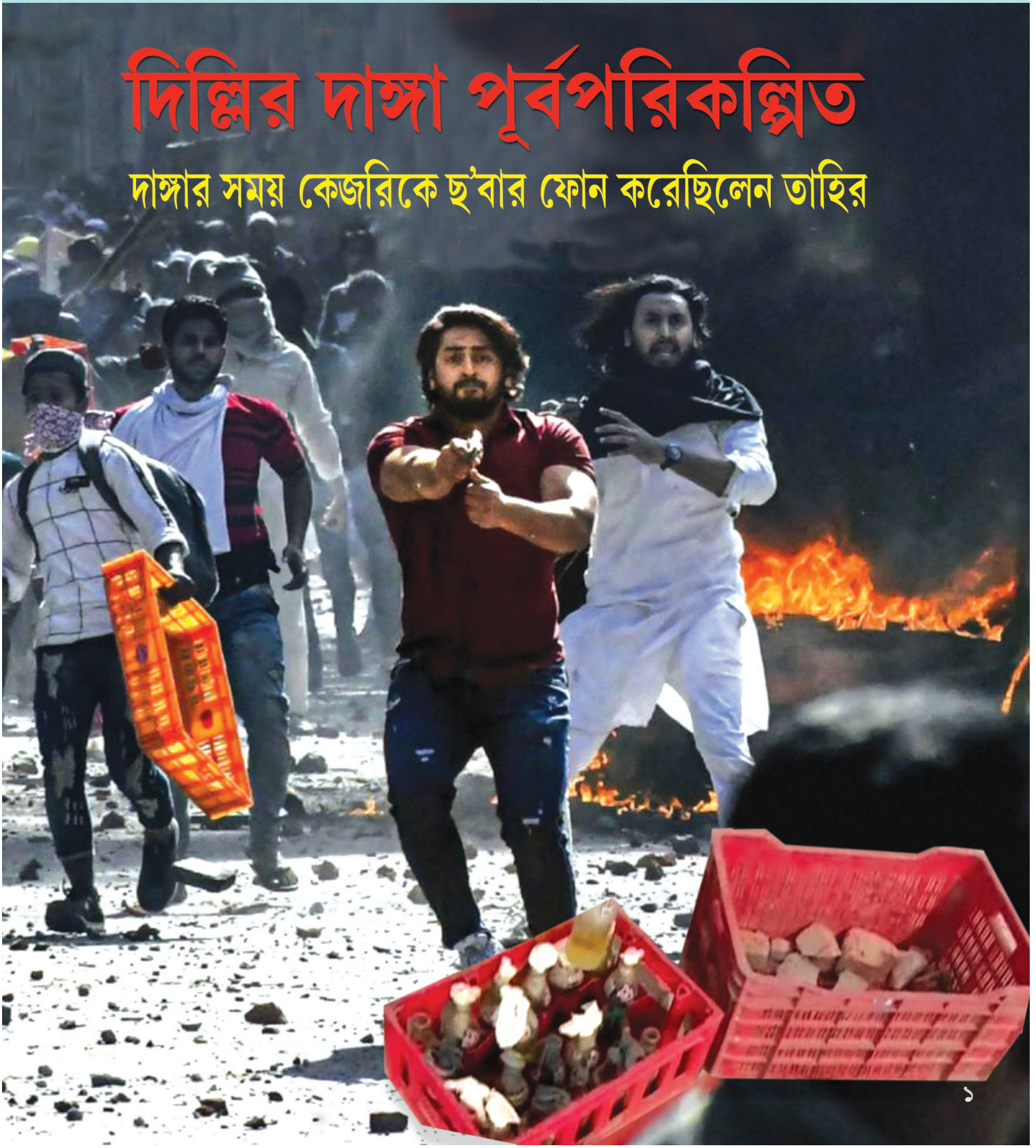

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ২৮ সংখ্যা, ২ চৈত্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

১৬ মার্চ - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

বাঙ্গালির সাংস্কৃতিক অবনমন ও বামপন্থা ▯ বিশ্বামিত্র **▯ ৬**

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমক্র্যাট প্রার্থী এখনো অনিশ্চিত ▯ শিতাংশু গুহ **▯ ৭**

নাগরিকত্ব সংশোধন আইন অপরিহার্য▯ হরিশ সালভে **▯ ৮**

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার এটাই উপযুক্ত সময় ▯ রঞ্জন কুমার দে **▯ ১১**

রাজনীতির বিভ্রান্তি ও সঙ্ঘ ▯ অসীম কুমার মিত্র **▯ ১৩**

দাঙ্গার নেপথ্য কুশীলব বামপন্থী এবং অতিবামপন্থীরা ▯ সুজিত রায় **▯ ১৫**

দাঙ্গাবাজ তাহির হুসেন দিল্লিওয়ালা নাকি বাংলাদেশি? ▯ দেবযানী ভট্টাচার্য **▯ ২৩**

দাঙ্গার সময় কেজরিকে ছ'বার ফোন করেছিলেন তাহির ▯ এন কে সুদ **▯ ২৬**

উত্তরবঙ্গের জনক মনীষী পঞ্চানন বর্মার স্বদেশ চেতনা ▯ বিনয় বর্মন **▯ ৩১**

বাঙ্গালির জাগরণ শুরু হয়েছে, এবার জয় সুনিশ্চিত ▯ ড. জিষ্ণু বসু **▯ ৩৪**

ভারতে মহিলা উদ্যোগপতিদের সমস্যা ▯ ড. রাজীব কুমার, পঙ্খুরি ভাট **▯ ৩৮**

উত্তর-পূর্বে দুটি ঐতিহাসিক চুক্তি ▯ এ সূর্যপ্রকাশ **▯ ৪৩**

যেখানে নারী পূজিত হন, সেখানে ঈশ্বর বিরাজ করেন ▯ নীতীন গড়করি **▯ ৪৫**

কাদের চক্রে পড়ে তরুণ-তরুণীরা দিশাহারা হয়ে পড়ছেন? ▯ সৌম্যজিৎ মাইতি **▯ ৪৬**

দিল্লির দাঙ্গায় কাদের উসকানি? ▯ রাজু সরখেল **▯ ৪৭**

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ অঙ্গনা : ২১ ▯ সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ২৯-৩০ ▯ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ▯ চিত্রকথা : ৪২ ▯ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮▯ শব্দরূপ : ৫০

প্রকাশিত হবে
২৩ মার্চ
২০২০

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
২৩ মার্চ
২০২০

করোনা ভাইরাসের কবল থেকে কীভাবে বাঁচবেন

এই মুহূর্তে সারা দেশে চর্চার একটাই বিষয়— করোনা ভাইরাস। ভারতে এই ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। এর সংক্রমণ আটকাতে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই বেশ কিছু সদর্থক ব্যবস্থা নিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফ থেকে একে 'মহামারী' ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু এই মহামারী আটকাতে শুধুমাত্র সরকারি ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়। সাধারণ মানুষেরও কিছু দায়িত্ব থেকে যায়। কি সেই দায়িত্ব, কীভাবে পালন করবেন সেই দায়িত্ব? এই মারণ ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচতে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে? বিশিষ্ট চিকিৎসক ও গবেষকরা জানাবেন এসবের উত্তর। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়— আতঙ্কিত নয়, করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

দিল্লির দাঙ্গা পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারত সফরের মুহূর্তে রাজধানী দিল্লি অগ্নিগর্ভ হইয়া উঠিয়াছিল। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বাতিল করিতে হইবে— এই দাবিতে দিল্লিকে কার্যত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি অংশ এবং ইহাদের সমর্থনকারী কয়েকটি রাজনৈতিক দল-সহ অতিবামপন্থীরা। অবশ্য ইহার বহু পূর্ব হইতেই দিল্লির শাহিনবাগে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতার নামে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল অবরোধ করিয়া উত্তেজনা সৃষ্টির কাজটি সুপরিকল্পিত ভাবেই চলিতেছিল। শেষ পর্যন্ত বারুদে অগ্নিসংযোগের কর্মটি সম্পাদিত হইয়াছিল মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারত সফরের ঠিক প্রাক্কালে। ইহা এখন বিশদে বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই যে, দিল্লির এই হাঙ্গামা একেবারেই সুপরিকল্পিত। শাহিনবাগে যেইদিন হইতে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে অবরোধ শুরু হইয়াছিল, সেইদিন হইতেই হাঙ্গামা বাঁধাইবার সলিতায় অগ্নিসংযোগের প্রস্তুতিও চলিতেছিল। হাঙ্গামাকরীরা অপেক্ষা করিতেছিল, উত্তেজনার মাত্রা আরও বৃদ্ধি করিয়া সময়সুযোগ মতো বারুদে অগ্নিসংযোগ করিতে। ট্রাম্পের ভারত সফর সেই সুযোগ তাহাদের আনিয়া দিয়াছিল। ট্রাম্পের ভারত সফরের সময়ই খোদ রাজধানী দিল্লিতে হাঙ্গামা বাঁধাইয়া সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়াছে এই বিরোধীরা। ট্রাম্পের ভারত সফরের সময়ই কেন হাঙ্গামা? বিরোধীদের ধারণা ছিল— ট্রাম্পের সফরের সময় রাজধানীতে এইরূপ হাঙ্গামা করিলে কেন্দ্র সরকার চূড়ান্ত অস্বস্তিতে পড়িবে এবং বিদেশি অতিথিদের সম্মুখে ভারতের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে। অবশ্য ভারতের মর্যাদার বিষয়টি দিল্লির বিরোধীদের চিন্তার বিষয় কখনই ছিল না। যদি থাকিত তাহা হইলে অন্তত বিক্ষোভকারীদের অন্যতম নেতা শারজিল ইমাম অসম-সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবার কথা বলিত না। দিল্লির হাঙ্গামায় বহু নিরপরাধ মানুষ প্রাণ হারাইয়াছে। দুইজন পুলিশ আধিকারিককেও হত্যা করা হইয়াছে। এই দুই পুলিশ আধিকারিকের মধ্যে একজনের দেহে চারশত বার ছুরিকাঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। হাঙ্গামাকারীদের অন্যতম যুবক শাহরুখকে পিস্তল হাতে পুলিশকে শাসাইতে দেখা গিয়াছে। এই শাহরুখের প্রকৃত পরিচয় আড়াল করিতে বামপন্থীরা কম কসরত করে নাই। শাহরুখকে চন্দ্রিল শর্মা নামে পরিচয় দিয়া দিল্লি হাঙ্গামার যাবতীয় দায় গৈরিক শিবিরের উপর চাপাইতে চেষ্টা করিয়াছিল বামপন্থীরা। তাহাদের সেই কারসাজি অবশ্য ধরা পড়িয়া গিয়াছে। শাহরুখ গ্রেপ্তার হইবার পর প্রামাণ হইয়াছে সে সর্বার্থে শাহরুখ, চন্দ্রিল শর্মা নয়। তেমনই ইহাও প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, দিল্লির হাঙ্গামার পিছনে অন্যতম হোতা হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন আম আদমি পার্টির অন্যতম নেতা তাহির হুসেন। তাহির হুসেনের বাড়ি হইতেই মজুত করা পেট্রল বোমা এবং হাঙ্গামায় ব্যবহৃত নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হইয়াছে। এখন এমনও প্রমাণ মিলিতেছে যে, দিল্লির দাঙ্গায় নিহত পুলিশ আধিকারিক অঙ্কিত শর্মাকে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হইয়াছিল এই তাহির হুসেনের নির্দেশেই। তবে, দাঙ্গাবাজ এবং তাহাদের সহযোগীরা দিল্লিকে যতই উত্তপ্ত করিয়া তুলিতে চাহুক না কেন, শেষ পর্যন্ত দিল্লির শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনতা যথাসময়ে প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিয়াছিল। এবং সেই প্রতিরোধের সম্মুখে পড়িয়া দাঙ্গাবাজরা শেষ পর্যন্ত লাঙ্গুল গুটাইয়া পলায়ন করিয়াছে।

দিল্লির দাঙ্গা যে একটি পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল ইহা বুঝিতে আর কাহারও বাকি নাই। এই ষড়যন্ত্র সরকারের বিরুদ্ধে, দেশের বিরুদ্ধে, দেশের মানুষের বিরুদ্ধে। সরকারের উচিত অবিলম্বে দিল্লির দাঙ্গার একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত করা। কাহাদের মদতে, কাহারা এই কাণ্ড করিল তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া ষড়যন্ত্রকারীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা। ষড়যন্ত্রকারীরা ক্ষমার যোগ্য নহে— ইহা মনে রাখিতে হইবে।

সুভাষিতম্

পঠতো নাস্তি মূর্খত্বং অপনো নাস্তি পাতকম্।

মৌনিনঃ নাস্তি কলহো ভয়ং নাস্তি জাগ্রতঃ।।

পঠনশীল ব্যক্তির মূর্খত্ব আসে না, মমত্ববোধসম্পন্ন ব্যক্তির পতিত হওয়ার ভয় থাকে না, মৌনী ব্যক্তিদের কলহ হয় না এবং জাগ্রত ব্যক্তিদের বিপদ হয় না।

বাঙ্গালির সাংস্কৃতিক অবনমন ও বামপন্থা

বিশ্বামিত্র-র কলম

দোল উৎসব উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি গানকে বিকৃত করে মহিলাদের পৃষ্ঠদেশে লেখা হয়েছিল। এর গোড়াপত্তনটি অবশ্য আরও আগে। এক বিকৃতমস্তিষ্ক গায়ক রোদ্দুর রায় অশ্লীল শব্দ যুক্ত করে রবীন্দ্রনাথের গানের কথাগুলো বিকৃত করে বিকৃত সুরে তা উচ্চারণ করেছিল। সেই ভিডিয়োটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর রোদ্দুর রায়ের পক্ষে অনেককে দাঁড়াতে দেখা গিয়েছিল। বস্তুত এই প্রবণতা অনেক দিনের। এক সময় শক্তি, সুনীলের মতো কবিরা লিখেছিলেন 'তিনজোড়া লাথির ঘায়ে—লুটাইতেছে রবীন্দ্র রচনাবলী'র মতো পঙ্‌ক্তি, বাঙ্গালির নবজাগরণের পর্ব অতিবাহিত হওয়ার পর একটা বিষয় আমরা বুঝে গিয়েছি যে, মনীষীদের অবমাননা করলে আমরা সহজেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারব। এই সামাজিক অবক্ষয়কে পরবর্তীকালে নকশাল আন্দোলনের রূপে পেয়েছি। সাতের দশকে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার ঘটনা আমাদের স্মরণে থাকতে পারে, এতকাল এই ধরনের অসভ্যতাগুলোকে, মনীষীদের অবমাননা করাকে বিপ্লব হিসেবেই দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম এবং এখনও সম্ভবত আছি। নইলে সাতের দশকে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার ঘটনাকে একটি বহুল প্রচারিত দৈনিকপত্রে সহানুভূতির সঙ্গে দেখা হতো না।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালি ভাষার অবক্ষয়ও ঘটেছে, যে ভাষা কয়েক দশক আগে পর্যন্ত গালিগালাজের অভিধানেও ঠাঁই পেত না, আজ প্রকাশ্যে উচ্চারণ করতে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ হচ্ছে না। ঘটনাটি নারী দিবসের প্রাক্কালে নারীর শরীরকে ব্যবহার করে ঘটানো হলো। এর উৎসটা কোথায় আমাদের বুঝতে হবে। স্বাধীনতা পরবর্তী যে বিজাতীয় ভাবধারা আমাদের আকৃষ্ট করেছিল বা মনীষীদের অপমান করতে শিখিয়েছিল, সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতাকে মদত দিয়েছিল তা এতদিন বিপ্লবের বহ্নিশিখা হিসেবে দেখা হয়েছে। সুতরাং এখন আর সোশ্যাল মিডিয়ায় শোরগোল ফেলে লাভ নেই যে বাঙ্গালির সংস্কৃতি বিপর্যস্ত। এই বিপর্যয় সেদিনই শুরু হয়েছিল যেদিন রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি বলা হয়েছিল, বিবেকানন্দকে বেকার যুবক, শ্রীরামকৃষ্ণকে মৃগীরোগী, নেতাজীকে তোজোর কুকুর বলা হয়েছিল, সেদিনই বাঙ্গালির চেতনা ও সংস্কৃতির জগৎ কলুষিত হয়েছিল আর আজকে মতাদর্শগত ভাবে যারা এখনো বামপন্থী, যারা তৃণমূলের পোশাক পরে আছে, তারা জাতপাতের বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছে, তারা অবাঙ্গালিদের 'গুটখাখোর', 'ধোকলা' ইত্যাদি অপমানসূচক কথা বলে আদতে বঙ্গ সংস্কৃতিরই সর্বনাশ করছে। মুশকিল হচ্ছে যে আগে বামপন্থীরা নির্দিষ্ট একটি দলভুক্ত থাকায় তাদের চিহ্নিত করা সহজ ছিল। কিন্তু এখন মানুষ সেই দলটিকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করায় সেই ভেকধারীরা বিভিন্ন দলে আশ্রয় নিয়েছে। সুতরাং রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ কোন দলের হাতে রয়েছে সেটি দেখার চেয়ে এটা বোঝা জরুরি যে এটা হলো আবহমান বাম সংস্কৃতির অঙ্গ।

বাঙ্গালির যে সার্বিক অবনমন তাকে এতকাল বিপ্লবের খোয়াব দেখিয়ে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে। হয়তো রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কদর্যতা তাকে অতিক্রম করে গেছে বলেই আজ বাঙ্গালি শিউরে উঠছে।

গত কয়েক বছর যাবৎ ফেসবুক জুড়ে যে 'ইতরামো'র উৎসব চলছে আমরা তার সাক্ষী আছি। দেশের প্রধান মন্ত্রী,স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নামে অবমাননাকর 'মিম', গালিগালাজ যে কখনো বাঙ্গালি রসবোধের পরিচায়ক হতে পারে না সেটা বোঝা দরকার কিংবা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয়তাবাদীদের আহত করার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় যে পৈশাচিক উল্লাস দেখা যায় সেটা বাঙ্গালিয়ানার সঙ্গে কখনো খাপ খায় না। একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ কিংবা অন্য রাজনৈতিক দলের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাব থেকে আমরা এগুলো করছি কিনা তা আজকে ভাবার সময় এসেছে। আমাদের মনের মধ্যেও যে বিদ্বেষ তাকে বাড়িয়ে নেওয়ার নানা কৌশল আছে। সেটা বিগত কয়েক বছর যাবৎ আমরা দেখেছি। সুতরাং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘটনা এই বাঁধা গতের ম্যধ্যই পড়ে। এটা ঠিক বাঙ্গালির যে সার্বিক অবনমন তাকে এতকাল বিপ্লবের খোয়াব দেখিয়ে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে। হয়তো রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কদর্যতা তাকে অতিক্রম করে গেছে বলেই আজ বাঙ্গালি শিউরে উঠছে। তবে আমাদের বুঝতে হবে যে, এখনোও সময় আছে সংশোধন করে নেওয়ার বা সংশোধিত করে দেবার, সেই বিজাতীয় ভাবধারা থেকে যা বিশ্ব সংস্কৃতির পক্ষে ক্ষতিকর তার শিকড় উপড়ে ফেলা, আমাদের মূল সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়ার, নচেৎ আগামীদিনে আরও বড়ো ধরনের বিপর্যয়ের সম্মুখীন আমরা হতে য চলেছি তা হলপ করেই বলে দেওয়া যায়। ■

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমক্র্যাট প্রার্থী এখনো অনিশ্চিত

আন্তর্জাতিক

শিতাংশু গুহ

রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড জে ট্রাম্প তা নিশ্চিত। ডেমক্র্যাট প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কে? এই প্রশ্নের উত্তর এ মুহূর্তে কারো জানা নেই। ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, সাবেক ভাইস-প্রেসিডেন্ট জে বাইডেন হবেন এবার ডেমোক্রেট প্রার্থী। দলীয় হাইকমান্ডের সমর্থন ছিল তাঁর পেছনে। মার্কিন গণতন্ত্রের চমৎকার কৌশলে তিনি এখন অনেকটা পিছিয়ে পড়েছেন। ভোটাররা বাইডেনকে তেমন একটা পছন্দ করছেন না? বাইডেন কি ফিরে আসতে পারবেন? সেই সম্ভাবনা এখনো শেষ হয়ে হয়নি। সুপার টুইস-ডে'র পর দৃশ্যপট পরিষ্কার হতে শুরু করে। বাইডেন থাকেন না বিদায় নেন, তা নির্ধারণে আরও কিছুটা সময় লাগবে।

সাবেক স্পিকার নিউট গিংরিচ বলেছেন, সুপার 'টুইস-ডে'র পর জে বাইডেন ও এলিজাবেথ ওয়ারেন বিদায় নেবেন। তার মতে এরপর চারজন প্রার্থীর মধ্যে ডেমক্র্যাটিক মনোনয়ন ঘুরপাক খাবে। তিনি বলেন, সাবেক নিউইয়র্ক মেয়র মাইক বুলুমবার্গ টাকা দিয়ে মনোনয়ন কিনতে চাইছেন! ডেমক্রেট শিবিরে এখন ৮ জন প্রার্থী মনোনয়ন লাভের জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স ৭৮, ফ্রন্ট রানার, তারপর আছেন ইন্ডিয়ানের সাবেক মেয়র পিট্ বুটিলেগ ৩৮, মিনেসোটার সিনেটর এমি ক্লোবুচার ৬৯, সাবেক ভাইস-প্রেসিডেন্ট জে বাইডেন ৭৭, মাইকেল ব্লুমবার্গ ৭৭, এলিজাবেথ ওয়ারেন ৭০, বিলোনিয়ার ব্যবসায়ী টম স্টেয়ার এবং হাওয়াই'র কংগ্রেস ওম্যান তুলসী গাবার্ড, ৩৮।

সুপার 'টুইস-ডে' মঙ্গলবার ৩ মার্চ ২০২০। এদিন একসঙ্গে আলাবামা, আরকানসাস, ক্যালিফোর্নিয়া, কলোরাডো, মেইন, ম্যাসাচুসেটস, মিনেসোট, নর্থ ক্যারেলিনা, ওকলাহোমা, টেনেসি, টেক্সাস, উটাহ, ভারমন্ট, ও ভার্জিনিয়ায় একসঙ্গে প্রাইমারি নির্বাচন। নেভাদায় ককাস ২২ ফেব্রুয়ারি, যদিও সেখানে 'আগাম ভোট' চলছে। সাউথ ক্যারোলিনায় প্রাইমারি ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০। ইতিমধ্যে আইওয়া এবং নিউ হ্যাম্পশায়ারে ককাস ও প্রাইমারি সম্পন্ন হয়েছে। আইওয়াতে বুটিগেগ এবং নিউ হ্যাম্পশায়ারে বার্নি স্যান্ডার্স জিতে সুবিধাজনক অবস্থানে আছেন। ২০১৬-তে বার্নি এ দুটো জেতেন, কিন্তু ডেমোক্রেট মনোনয়ন পান হিলারি ক্লিন্টন।

নিউইয়র্কের সাবেক মেয়র মাইকেল ব্লুমবার্গ দেরিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন এবং নবম ডেমক্র্যাট টিভি বিতর্কে অংশ নেওয়ার প্রথম সুযোগ পান ১৯ ফেব্রুয়ারি। প্রায় সকল প্রার্থী তাঁকে আক্রমণ করেন। সিনেটর এলিজাবেথ ওয়ারেন তাঁকে মহিলাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। অন্যরা বুলুমবার্গকে তাঁর অপ্রকাশিত ট্যাক্স-রিটার্ন, নিউইয়র্ক মেয়র থাকাকালে কালোদের বিরুদ্ধে স্টপ অ্যান্ড ফ্রিস্ক পলিসি, তাঁর অঢেল সম্পদ প্রসঙ্গ তোলেন। বুলুমবার্গ প্রশ্ন তুলেন বার্নি স্যান্ডার্স কি নির্বাচিত হতে পারবেন? ব্লুমবার্গ এ পর্যন্ত ৩০০ মিলিয়ন ডলার খরচ করেছেন, তিনি এক বিলিয়ন ডলার খরচের পরিকল্পনা নিয়েছেন।

ডিক মরিস, যিনি আরকানসাস থেকে ক্লিন্টন দম্পতির রাজনৈতিক গুরু ছিলেন, তিনি সদ্য অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, হিলারি ক্লিন্টন ডেমক্রেটিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামছেন। ২০১৬-তে ডিক মরিস বলেছিলেন যে, ট্রাম্প নির্বাচিত হবেন। তার ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক হয়েছিল। হিলারি কি আসলেই নামছেন? পিট্ বুটিগেগ'কে কেউ চিনতো না। তার উত্থান বেশ চমকপ্রদ। সদ্য সর্বোচ্চ বেসামরিক পদকপ্রাপ্ত রেডিয়ো-হোস্ট রাস লিম্বো বলেই ফেলেছেন যে, আমেরিকানরা এখনো একজন 'সমকামী'-কে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রস্তুত নয়। এ থেকে ধারণা করা হচ্ছে, ট্রাম্প শিবির হয়তো পিট্ বুটিগেগ-কে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রস্তুত নয়। এ থেকে ধারণা করা হচ্ছে, ট্রাম্প শিবির হয়তো পিট্ বুটিগেগ-কে সেক্সচুয়াল লাইনে অ্যাটাকের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

এদিকে ট্রাম্প ও বুলুমবার্গের মধ্যে ইতিমধ্যে এক পশলা 'টুইট-যুদ্ধ' হয়ে গেছে, যা কারো কারো মতে স্কুলের বাচ্চাদের মতো বালখিল্য! অন্যদিকে অ্যাটর্নি জেনারেল ইউলিয়াম পি বার ক'দিন আগে বলেছেন, ট্রাম্পের টুইটের কারণে কাজ করা অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, বিচার বিভাগকে দিয়ে টুইট বন্ধ হওয়া দরকার। ট্রাম্প বলেছেন, উইলিয়াম পি বার-কে পরামর্শ দেওয়ার অধিকার তাঁর আছে। ট্রাম্পের বন্ধু রজার স্টোন মামলা নিয়ে এই দ্বন্দ্ব। এই মামলার প্রেক্ষিতে প্রায় দুই হাজার কৌঁসুলি অ্যাটর্নি জেনারেলের পদত্যাগ দাবি করেছেন। জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট বলেছেন, অ্যাটর্নি জেনারেল পদত্যাগ করেছেন না।

ওয়াশিংটন পোস্ট-এবিসি জরিপ জানাচ্ছে, বার্নি স্যান্ডার্স তার নিকটতম ডেমক্রেট প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে এই প্রথম 'ডবল ডিজিট' এগিয়ে গেছেন। একই জরিপে জানুয়ারিতে জে বাইডেন এগিয়ে ছিলেন। ট্রাম্পের জন্যে ভালো খবর হচ্ছে, ২০১৬-তে তাঁর বিশ্বস্ত হোপ হিক্স হোয়াইট হাউসে ফিরে আসছেন, তিনি ২০১৮ পর্যন্ত হোয়াইট হাউস কমিউনিকেশন ডিরেক্টর ছিলেন। নেভাদার বৃহৎ শ্রমিক ইউনিয়ন (কুলিনারি ইউনিয়ন) বার্নি স্যান্ডার্সের বিরুদ্ধে কাজ করছেন। হাউস ও সিনেট বাই-পার্টিজান প্রস্তাব পাশ করেছে যে, ইরানে পুনরায় আক্রমণ করতে হলে ট্রাম্পকে কংগ্রেসের অনুমতি নিতে হবে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এতে ভেটো দেবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই? ■

নাগরিকত্ব সংশোধন আইন অপরিহার্য

অতিথি কলম

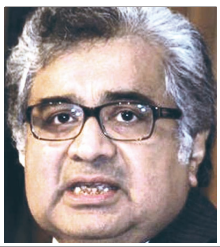

হরিশ সালভে

এই আইন নিয়ে বিতর্ক অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারও রূপ নিল। তবু আমি এই বিরোধিতার মধ্যে ছিটেফোঁটা সারবত্তাও খুঁজে পেলাম না। ১৯৪৬-এর ফরেনার্স অ্যাক্ট ও ১৯৫৫-র নাগরিকত্ব আইনের মাধ্যম অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত পাঠানো চালু আছে। দেশের উত্তরপূর্বাঞ্চলে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে নিয়ে অনেক সমালোচনা হলেও তার পেছনে যুক্তি রয়েছে। ১৯৪৬ ও ১৯৫৫ এই দুই আইনের বলেই পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আগত অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত পাঠানো হয়। এখন 'নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ২০১৯' যদি প্রত্যাহার করা হয় সেক্ষেত্রে বাংলাদেশি ও অন্য জায়গা থেকে আসা অবৈধ মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের কিন্তু ফেরত যেতে হবে। যেমন যেতে হবে শিখ, বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান অনুপ্রবেশকারীদেরও।

বিশ্বের আইনের শাসন লাগু থাকা সমস্তদেশেই নাগরিকত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে মোটামুটি একই ধরনের নীতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। দেশের নাগরিক হওয়ার যোগ্যতা জন্ম, উত্তরাধিকার সূত্র, সরকারি আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় বসবাস বা দেশটি যদি অন্য কোনো দেশ দ্বারা অধিকৃত হয়ে যায় এই প্রয়োজনীয় শর্তগুলির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। এটা খুবই সহজ কথা যে যারা নির্দিষ্ট দেশের অনুমতি ছাড়াই সেদেশে প্রবেশ করে তাদেরই অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বলা হয় ও পত্রপাঠ ফেরত পাঠানোই নিয়ম।

বাংলাদেশ যুদ্ধজনিত কারণে উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজ্য অসমে যেভাবে দেশের বসবাসকারীদের সংখ্যায় ও পরিচয়ে আমূল পরিবর্তন ঘটে যায় তাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে অসম চুক্তি সম্পাদনা জরুরি হয়ে পড়ে। এই চুক্তির মধ্যেই অবৈধ অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করার নিয়মাবলী ও বিশেষ আইন তৈরি করা হয়। তবুও যথার্থ বিদেশি চিহ্নিতকরণ ও বিতাড়ন প্রায় অসম্ভব কাজে পরিণত হয়। দেশের আদালতে এই আইনটি 'অসম চুক্তি'র মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে চ্যালেঞ্জ করা হয়। সর্বোচ্চ আদালত আবেদনকারীদের যুক্তি মেনে সনোওয়াল সরকারকে বিদেশি চিহ্নিতকরণে ও প্রত্যার্পণে ব্যর্থ হওয়ার জন্য দায়ী করে। মনে রাখতে হবে এই মামলাটিকে কেন্দ্র করেই 'ডিটেনশন ক্যাম্প' তৈরির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৬ সালে প্রথম সংসদে পেশ হওয়ার পরই উভয় সভার যুগ্ম সংসদীয় কমিটির কাছে পর্যালোচনার জন্য পাঠানো হয়। ২০১৯ সালের ৪ জানুয়ারি সংসদীয় কমিটি তাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে।

> "আমাদের দেশের নাগরিক সমাজের ওপর যারা বৌদ্ধিক আধিপত্য জারি রাখতে মরিয়া তারা রাজনৈতিক ইতিহাসের এই ধূলিমলিন মতাদর্শকে তুলে ধরার রোমান্সে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিভোর হয়ে আছেন। এরই ফলে অযথা বিতর্ক ও আক্রমণাত্মক প্রতিবাদ মাথা চাড়া দিচ্ছে।"

২০০৩ সালে এ সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে উল্লেখ করা হয়েছিল একটি জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) তৈরির ক্ষেত্রে দেশের বসবাসকারীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হবে। কোনো ব্যক্তির দেওয়া তথ্যাবলীর মধ্যে কোনো অসঙ্গতি থাকলে তাঁকে আলাদা করতে হবে। পরবর্তীকালে আরও নিরীক্ষণ সাপেক্ষে নিশ্চিত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। এই নিয়মাবলী কিন্তু বিগত ১৬ বছর ধরে গৃহীত হওয়া অবস্থাতেই পড়ে আছে। এর কোনো প্রয়োগ হয়নি। আমার মাথায় কিছুতেই এই ব্যাপারটা ঢোকে না যে যদি একটি আইন কোনো নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত এক শ্রেণীর মানুষকে নাগরিক হওয়ার অধিকার দেয় যে অধিকার পাওয়ার যোগ্যতা একটি যুক্তিগ্রাহ্য প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই অর্জন করতে হচ্ছে সেই আইনকে কেন এমন ধিক্কার জানানো হচ্ছে বা হবে? বলা হচ্ছে এটি বৈষম্যমূলক কেননা এটি আরও একটি বিশেষ শ্রেণীকে কেন আইনের আওতাভুক্ত করে তাদেরও এই অধিকার দিল না? তারা নাকি সুবিধে থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সমান অধিকারের নীতি একথা কখনই বলে না যে দেশে লাগু করা প্রত্যেকটি আইনকেই বাধ্যতামূলকভাবে সকলের ওপরই প্রযোজ্য হতে হবে। সাম্যের নীতি অনুসরণ করার অর্থ এই নয় যে এর ফলে রাষ্ট্র তার সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনী শ্রেণীবিভাগ করতে পারবে না। আরও পরিষ্কার করে বললে এটাই দাঁড়ায় যে যদি কোনো আইন একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর সকলের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য হয় তাহলে অন্য একটি শ্রেণীর ওপরও তা কেন তাদের ইচ্ছে মতো একইভাবে প্রযোজ্য হবে

না যদি তাদের ক্ষেত্রে আলোচ্য আইনের আদৌ কোনো প্রাসঙ্গিকতা নাও থেকে থাকে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ আদালত কিন্তু বারবার বলেছে এ বিষয়ে তাদের এই ধরনের বিষয়ে নাক গলানোর কোনো প্রয়োজন নেই। দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক এমন সমাধানে পৌঁছনোর অনেক বিকল্প রাস্তাই খোলা আছে। এ বিষয়ে দেশের নির্বাচিত সরকারের হাতেই কোন পদ্ধতিটি সঠিক সমাধান পাওয়ার উপযুক্ত তা নির্বাচনের দায়িত্ব থাকা উচিত এমনটাই সর্বোচ্চ আদালতের অভিমত। এখন সকলেই জানেন সিএএ-র মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে আগত সেখানকার সংখ্যালঘু মানুষদের নাগরিকত্ব প্রদান করা, সত্যি কি আমাদের প্রামাণ্য দলিলের প্রয়োজন আছে এটা বুঝতে যে এই ইসলামি ধর্মীয় দেশগুলির সংখ্যালঘুদের ওপর কী ধরনের নির্যাতন হয়ে থাকে? দেশের নির্বাচিত সংসদ যদি একথাটা মনে রেখে এই অবিচারের একটা সুরাহা করতে এই সংখ্যালঘুদের পাকাপাকি সুরক্ষা দিতে চায় তাহলে তারা কি খুব অন্যায় করবে?

হ্যাঁ, বলা দরকার ধর্মের ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগ করা মানেই তা জন্মসূত্রে অসাংবিধানিক এটা ঠিক কথা নয়। মনে রাখা দরকার, আমাদের সংবিধান দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়কে বিশেষ অধিকার প্রদান করে রেখেছে। সংশ্লিষ্ট আইনটির পরিধি বাড়িয়ে যদি পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষকে বিনা বাধায় ভারতে আসার ছাড়পত্র দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে এই সমস্ত দেশগুলির সঙ্গে আমাদের সীমান্তরেখাও তুলে দেওয়া উচিত।

কোনো কোনো মহল থেকে এখনও মন্ত্রণা দেওয়া হচ্ছে যে, আইনের বৈষম্য দূর করতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে যে কোনো জনগোষ্ঠীই যদি ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয় তাদের সকলের ক্ষেত্রেই এই আইন লাগু করে নাগরিকত্ব দেওয়া উচিত। আশার কথা, দেশের সাহসী আইনজ্ঞরা কিন্তু এখনও পর্যন্ত উল্লেখিত দাবির পেছনে দাঁড়াননি। তার একটা কারণ সম্ভবত যে তাঁরা টিভি চ্যানেলের সঞ্চালক নন বা নাগরিক সম্প্রদায়ের উচ্চকোটির বুদ্ধিজীবী নন যারা রাস্তায় নেমে এ ধরনের আওয়াজ তুলছেন। সবচেয়ে উচ্চকিত সমালোচনা হচ্ছে এমনটা ধরে নিয়ে বা ইচ্ছে করে ভুল বোঝানোর জন্য যে এই সরকার দেশ থেকে মুসলমানদের উৎখাত করতে চায়। দেশে এমন কোনো আইন, নীতি, ঘোষণা বা বিজ্ঞপ্তির অস্তিত্ব মাত্র নেই যাতে এই ধরনের কোনো অভিপ্রায় রয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এই ধরনের প্রসঙ্গ প্রকাশ্যে অস্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে একথা নিশ্চিতভাবে সত্যি যে দেশের অভ্যন্তরে যদি শুধুমাত্র মুসলমানদের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে এমন কিছু পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় যা অন্যান্য দেশবাসীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে না সেক্ষেত্রে সেই পদ্ধতি সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক বলে বিবেচিত হতে বাধ্য।

দেশের যে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে বাংলাদেশ যুদ্ধের কারণে উদ্বাস্তু আগমনের ফলে সেখানকার জনগোষ্ঠীর চরিত্রগত আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে তার অবস্থান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেই বিষম পরিস্থিতি সংশোধন করতে যে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেই ব্যবস্থাই সারা ভারতে প্রয়োগ করার মানদণ্ড করা হবে এমনটা ধরে নেওয়া আইনের জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা বই কিছু না। জাতি ধর্মের মধ্যে মেরুকরণের বিষয়টি আদৌ নতুন নয়। আধুনিক ভারতের সংজ্ঞা নির্ণয়ের সময় থেকেই তা চালু ছিল। এই সূত্রে আর একটি ক্রমবর্ধমান মেরুকরণ কিন্তু আমার নজরে পড়ছে তা হলো এতদিন যে শ্রেণী ক্ষমতার উৎস থেকে বয়ে আসা সুবিধেগুলি যুগ যুগ ধরে একচেটিয়া ভাবে ভোগ করে এসেছেন তাদের সঙ্গে যারা তাদের বিকল্প হিসেবে উঠে এসেছে সেই শক্তির। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে একটি সুবিধেজনক অলীক বিলাসিতা। পৃথিবীতে বিশেষ চরিত্রের কিছু আদর্শ বা মতবাদ যা তার জন্মস্থল-সহ তাবড় বিশ্বে পরিত্যক্ত হয়ে গ্রন্থাগারের নিরাপদ আস্তানায় ধুলো সংগ্রহ করছে সেগুলিকে গৌরবান্বিত করার এক প্রচেষ্টা। আমাদের দেশের নাগরিক সমাজের ওপর যারা বৌদ্ধিক আধিপত্য জারি রাখতে মরিয়া তারা রাজনৈতিক ইতিহাসের এই ধূলিমলিন মতাদর্শকে তুলে ধরার রোমান্সে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিভোর হয়ে আছেন। এরই ফলে অযথা বিতর্ক ও আক্রমণাত্মক প্রতিবাদ মাথা চাড়া দিচ্ছে। দেশের নানা জায়গায় এই অলীক কারণে প্রতিবাদী রোমান্স চালানোর স্থানে সত্যকে তুলে ধরলেই এমন একটা অনুভূতি চাউর করা হচ্ছে— কেন যে সত্যিটা এনে এমন জব্বর প্রতিবাদী চরিত্রের গপ্পোটা মাটি করলে! হায়রে!

(লেখক ভারতের প্রাক্তন সলিসিটার জেনারেল এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name	:	**OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No.	:	**917020084983100**
IFSC Code	:	**UTIB0000005**
Bank Name	:	**AXIS Bank Ltd.**
Branch	:	**Shakespeare Sarani, Kolkata**

রম্যরচনা

কারণ একই

শ্যামবাবু বাজারে গিয়ে মাছ কিনলেন। মাছ বিক্রেতা বলল— বাবু, ওজনে একটু কম দিলাম। আপনার নিয়ে যেতে সুবিধে হবে। শ্যামবাবু টাকা দিলেন। মাছ বিক্রেতা বলল— আরে কম দিলেন, ব্যাপারটা কী? শ্যামবাবু একটু মুচকি হেসে বললেন, কারণ একই। আপনার গুনতে সুবিধে হবে।

আহাম্মক

বিয়ের তিন মাস পরে পল্টু স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুড়বাড়ি যাচ্ছে। বাস থেকে নেমে স্ত্রীর সঙ্গে গল্পে মশগুল থাকায় রাস্তায় দুই মস্তানের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল। কথা কাটাকাটির পর এক মস্তান পল্টুকে জোরে ঘুসি মেরে দেয়। পল্টু বলল, আর একবার মেরে দেখ তোমাকে মজা দেখাচ্ছি। মস্তান আবার একটা ঘুসি মারল। পল্টু বলল, আমার বউকে মেরে দেখ, তোমার ক্ষমতা কত। মস্তান তার বউকে দুটো ঘুসি মারল। তখন কিছু লোকজন এসে পড়ায় মস্তান দুটি পালিয়ে গেল। যেতে যেতে পল্টুর বউ পল্টুকে বলল— তুমি তো খুব আহাম্মক। তুমি মার খেলে খেলে, আবার বউকেও মার খাওয়ালে! পল্টু বলল, তুমি তো আর কাউকে বলতে পারবে না যে রাস্তায় আমি মার খেয়েছি।

উবাচ

জগদীপ ধনকর
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল

"আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য একমাত্র আচার্যের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিতে পারেন। শিক্ষামন্ত্রীর কাছে নয়। উপাচার্যের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হবে কি না সে ব্যাপারে একমাত্র সিদ্ধান্ত নিতে পারেন আচার্য অর্থাৎ রাজ্যপাল।"

রবীন্দ্র ভারতী কাণ্ডে উপাচার্যের পদত্যাগ প্রসঙ্গে

শিবরাজ সিংহ চৌহান
মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

"জ্যোতিরাদিত্য যতদিন কংগ্রেসে ছিলেন ততদিন তিনি ছিলেন মহারাজা। দল ছাড়ার পর কংগ্রেস ওকে বলছে মাফিয়া।"

জোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার দলত্যাগ প্রসঙ্গে

অসাদুজ্জমান খান কামাল

"বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অকৃত্রিম বন্ধুদেশ ভারত। সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন নরেন্দ্র মোদী। তাঁর উপস্থিতিতে কোনো অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

বাংলাদেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন সফরের প্রাক্কালে জামাতপন্থীদের বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে

দিলীপ ঘোষ
বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ

"হিন্দুদের তেল মেরে এখন ভোটে জেতার চেষ্টা করছেন দিদি। এতকাল মুসলমানদের তেল মারা হয়েছে। নমাজ পড়েছেন, দেখলেন মানুষ ভালোভাবে নেয়নি। তাই এখন ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছেন।"

এগরায় দলীয় সভায়

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়

রঞ্জন কুমার দে

ইংরেজিতে একটি শব্দ রয়েছে Population Blast অর্থাৎ জনবিস্ফোরণ। আজকের দিনে বিশাল বিশাল পারমাণবিক বোমার থেকেও ভয়ংকর এই জনবিস্ফোরণ, এককালে চীন এই মহামারিতে জর্জরিত হলেও 'এক সন্তান নীতি'তে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ এখন চীনের নিয়ন্ত্রণে। গত বছরের জুন মাসে 'The World Population Prospects 2019 : Highlights' শিরোনামে প্রকাশিত হয় যে, ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের জনসংখ্যা ৭৭০ কোটি থেকে বেড়ে ৯৭০ কোটিতে পৌঁছে যাবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই রিপোর্টের সবচেয়ে ভয়ংকর দাবি, জনসংখ্যায় আগামী ৮ বছরের মধ্যে চীনকে টপকে ভারতের স্থান শীর্ষে হবে। বিশ্বের জনসংখ্যা বিস্ফোরণে আগামী দিনে ভারত ছাড়াও আরও ৮টি দেশ তালিকাভুক্ত রয়েছে— পাকিস্তান, কঙ্গো, ইথিওপিয়া, তানজানিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইজিপ্ট এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৯০ সালে মহিলা পিছু গড় সন্তানের জন্মহার ছিল ৩.২।২০১৯ সালে দাঁড়িয়েছে ২.৫ এবং ২০৫০ সালে কমে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা ২.১-এ। সমীক্ষানুসারে এশিয়া, ইউরোপের জনসংখ্যা কমার সম্ভাবনা প্রবল থাকলেও আফ্রিকান দেশগুলির কঙ্গোতে ৩০.৪ শতাংশ, ইথিওপিয়াতে ১৫৬ শতাংশ, তানজানিয়াতে ৩৭৮ শতাংশ এবং মিশরে ১২০ শতাংশ জনসংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা। তবে সুখকর তথ্যে এই যে, ২১০০ সালের মধ্যে ব্রাজিলে ১৫ শতাংশ, বাংলাদেশে ৮ শতাংশ, রাশিয়ায় ১৪ শতাংশ এবং চীনে প্রায় ৩৭ কোটি জনসংখ্যা কমার সম্ভাবনা আছে।

স্বাধীনতার পর থেকে সংসদে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩৫টি প্রাইভেট মেম্বার বিল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকল্পে উত্থাপিত হয়েছে যাদের মধ্যে অধিকাংশই কংগ্রেস সদস্যদের। বিজেপির ৮ সদস্য, টিডিপির ৫, তৃণমূল কংগ্রেস, আরজেডি, সপাদের একজন করে সদস্য, বাকি কিছু ক্ষেত্রীয় সাংসদ সদস্য উত্থাপিত করেছিলেন। সর্বশেষ বিলটি ২০১৮ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সঞ্জীব বালিয়ান উত্থাপিত করেছিলেন। ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ একটি স্পর্শকাতর ইস্যু। তারপর ১৯৭৫-৭৭ সালে কংগ্রেসের সঞ্জয় গান্ধী জবরদস্তি বন্ধ্যাকরণে জোর দিলে ভোটব্যাঙ্কে যথেষ্ট প্রভাব পড়ে এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প হিমঘরেই চলে যায়। কিন্তু তৎকালীন সরকারগুলো বিচক্ষণতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলে আজকে জনসংখ্যার বাড়তি বোঝা দেশকে বইতে হতো না। বিগত সরকারগুলো যদি আইন প্রয়োগ করে ন্যূনতম দুই সন্তানের অধিক পরিবারকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ভোটদানে বিরত রাখতো, সরকারি চাকরিতে অগ্রহণযোগ্যতা, অধিক করদানের ব্যবস্থা লাগু করতো তাহলে নিশ্চিত জনসাধারণ স্বেচ্ছায় পরিবার পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে আসতো। গত আদমশুমারির (২০১১) জনসংখ্যার ৪.৪ গুণ বেশি। তুলনামূলকভাবে চীনে ১৯৫০ সালের জনসংখ্যা ৫৫ কোটি ছিল কিন্তু সেখানে জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতিতে ৭০ বছর পর চীনের জনসংখ্যা মাত্র ১৪২ কোটিতে পৌঁছেছে যেটা ১৯৫০-এর তুলনায় মাত্র ২.৫৮ গুণ বেশি। উল্লেখ্য যে, চীনের মোট জমি ভারত থেকে ২.৯১ বেশি এবং ভারত পৃথিবীর মাত্র ২ শতাংশ ভূমি গ্রহণ করে পৃথিবীর ১৯ শতাংশ জনসংখ্যার বোঝা বহে চলছে। ভারতবর্ষ যদি ন্যূনতম ১৫ বছরের জন্য পরিবার পরিকল্পনা আইন বাধ্যতামূলক করে তাহলে প্রাথমিকভাবে কিছুটা জনসংখ্যার চাপ থেকে স্বস্তির অনুমান করা যায়।

> **দেশের বিরোধী দলগুলি যখন বিশেষ এক ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতি দুর্বল তখন দেশের অভিভাবক প্রধানমন্ত্রীকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে তো সাহসী কোনো পদক্ষেপ নিতেই হবে।**

সম্প্রতি প্রবীণ আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায়ের এক আবেদনে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র সরকারকে ভর্ৎসনা করে জবাব চায় যে সংবিধানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কানুন লাগু করার নীতি থাকলেও জনসংখ্যা বিস্ফোরণে সরকার কেন উপযুক্ত কোনো পদক্ষেপ নিতে সচেষ্ট নয়? ২০১১ সালের শেষ আদমশুমারির হিসাবানুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যা ১২১ কোটির সামান্য উপরে ছিল, কিন্তু ২০২১-এর আদমশুমারির আগেই বর্তমানে ভারতে ১২৫ কোটি মানুষের আধার কার্ড বানিয়ে নিয়েছে। প্রায় ২৫ কোটি মানুষ এখনো আধার বানায়নি এবং কয়েক কোটি অবৈধ নাগরিক ভারতে বসবাস করছে। অর্থাৎ বর্তমানে আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৫০ কোটির সংখ্যায় পৌঁছে চীনকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষিযোগ্য জমি মাত্র ২ শতাংশ এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল মাত্র ৪ শতাংশ পরিমাণ আছে। উল্লেখ্য, তৎকালীন অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকারের আমলে

১১ সদস্যের এক সংবিধান সমীক্ষা আয়োগ দুই বছরের কঠোর পরিশ্রমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকল্পে সংবিধানে ৪৭ (এ) অনুচ্ছেদ যুক্ত করতে এবং তৎক্ষণাৎ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন বলবৎ করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রস্তাব জানিয়েছিল। কিন্তু দিল্লিতে এরপর অনেক রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটলেও, সংসদে অনেক ধারা যুক্ত এবং বিলুপ্ত হলেও আর কোনো কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্যন্ত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকল্পে পূর্ণরূপে সক্রিয় হতে পারেনি। অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড়, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং হরিয়ানা সরকার পঞ্চায়েত প্রার্থীর সর্বোচ্চ দুই সন্তান সম্পর্কীয় আইন প্রণয়ন করলেও পরবর্তী সময়ে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা সরকার আবার আইন সংশোধন করে তাদের রাজ্যে আইনটি বাতিল করে। হরিয়ানা বিধানসভা পঞ্চায়েত প্রার্থীর দু'সন্তান সম্পর্কীয় সিদ্ধান্ত ২০০৫ সালে উঠিয়ে দেয়। The Rajasthan Various Services (Amendment) Rules 2001-এর মাধ্যমে রাজস্থান সরকার আইন প্রণয়ন করে যে ০১.০৬.২০০২ তারিখের পরে তৃতীয় সন্তান জন্ম নিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সকল সরকারি চাকরি এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে অযোগ্য বিবেচনা করা হবে। The Amendment Rules 2001-এর সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে রাজস্থান উচ্চ ন্যায়ালয়ে DBCWP No. 18662/2012 অভিযোগ দাখিল করলে মহামান্য আদালত সরাসরি নাকচ করে দেয়। The Madhya Pradesh Civil Services (General Condition of Services) Rules-এর সংশোধনীর মাধ্যমে মধ্যপ্রদেশ সরকার আইন প্রণয়ন করে যে ২৬.০১.২০০১ তারিখের পরে তৃতীয় কোনো সন্তান জন্ম নিলে সকল প্রকার সরকারি চাকরি থেকে বঞ্চিত রাখা হবে। The Maharashtra Civil Services (Declaration Of Small Family) Rules 2005 অনুসারে দু'সন্তানের অধিক সন্তান জন্ম দিলে সরকারি চাকরি-সহ অন্যান্য সরকারি ভাতা থেকে বঞ্চিত রাখা হবে। মহামান্য উত্তরাখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয় ১৭.০৯.২০১৯ তারিখে SAL No. 736/2019-এ রায়দান করে যে দু'সন্তানের অধিক সন্তান জন্ম দিলে সরকারি চাকরিতে প্রসবকালীন ছুটি মঞ্জুর হবে না। গত ২৫ জুন ২০১৯-এ উত্তরাখণ্ড পঞ্চায়েতি রাজ (সংশোধনি) বিল ২০১৯ রাজ্য বিধানসভায় বিরোধীদের প্রবল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও পঞ্চায়েত আইন সংশোধনী করে দু'সন্তানের নীতি কার্যকারী করা হয়। অসমের পঞ্চায়েত আইনের সূত্র ধরে Section 111(2) Assam Panchayat Act 1994 অনুসারে কাছাড় জেলার বড়োখলা বিধানসভা কেন্দ্রের ভাঙ্গারপার জিপিতে কংগ্রেসের আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য নার্গিসকে তিন সন্তানের জন্ম দেওয়ায় পদ থেকে অপসারিত করা হয়। উল্লেখ্য, অসমে পৌরসভা প্রার্থীদেরও দু'সন্তান নীতি কার্যকারী হয়েছে।

১৯৭৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে জরুরি অবস্থার সময়ে সঞ্জয় গান্ধী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এক বন্ধ্যাত্বকরণ অভিযান চালান, যেখানে সরকারি পুলিশ, কর্মকর্তাদের বাধ্যতামূলক এর আওতায় আনা হয়। গ্রাম-শহরে অনেক জবরদস্তি বন্ধ্যাত্বকরণ করার ফলে প্রায় ৬২ লাখ লোকের বন্ধ্যাত্বকরণ হয়ে যায় যার মিশ্র প্রভাবে পরবর্তী ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের হার হয়। তারপর 'পরিবার নিয়োজন' প্রকল্পের নাম বদলে হয় 'পরিবার পরিকল্পনা'। কোনো কেন্দ্রীয় সরকারই জ্বলন্ত এই ইস্যুতে হস্তক্ষেপ করার আর সাহস পায়নি। সম্প্রতি ৭৩ তম স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে দেশবাসীর কাছে ছোটো পরিবারের আহ্বান জানান এবং সেটাকে দেশভক্তির অন্যরূপ হিসেবেও বর্ণিত করেন। প্রধানমন্ত্রী দেশের জনসংখ্যা বিস্ফোরণে এতটাই চিন্তিত যে দেশের শিক্ষিত সমাজকে পরিবারে জন্ম নিয়ন্ত্রণে সচেতনতার আকুল আবেদন জানান এবং ছোটো পরিবারের সুফলতা তুলে ধরেন। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো বিশাল জনসংখ্যার দেশে একটি বিশেষ সম্প্রদায় ধর্মান্ধতায় বিভোর তারা জেনে বা না জেনে জন্মহার বৃদ্ধি করে চলেছে। তাই ভোটব্যবসায়ীরাও তাদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করে চলেছে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে, সংখ্যালঘু নেতা আসাদুদ্দিন ওয়েসির মতো উচ্চশিক্ষিত লোক দেশের জনসংখ্যা বিস্ফোরণকে সমর্থন করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সৎ আহ্বানকেও সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ বলতে দ্বিধাবোধ করেন না। তাহলে আমরা কীভাবে ওই ধর্মান্ধ অশিক্ষিত সমাজ থেকে কিছু আশা করতে পারি! উল্লেখ্য যে, ২০০১-২০১১ সাল পর্যন্ত মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৪.৬ শতাংশ ছিল যা দেশের মোট জনসংখ্যার ১৪.২ শতাংশ কিন্তু সেটা ২০০১ সাল পর্যন্ত ১৩.৪ শতাংশ ছিল। অন্যদিকে হিন্দুদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১৬.৮ শতাংশ যা গত দশকের তুলনায় ৩.২ শতাংশ কম। ভারতবর্ষের মতো ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশে যেখানে ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে অসফল সেখানে প্রতিবেশী ইসলামিক দেশ পাকিস্তান ২০২৫ পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৫ শতাংশের নীচে রাখার টার্গেট রেখেছে। বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালে সক্ষম দম্পতি প্রায় ৮ শতাংশ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করতেন সেই সংখ্যা এখন ৬৩.১ শতাংশে অর্থাৎ বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখন মাত্র ২ শতাংশের একটু উপরে। উল্লেখ্য যে, সেখানকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি শিক্ষা বিভাগ, এমনকী মাদ্রাসায়ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকল্পে জোর সচেতনতা অভিযান চালানো হয়ে থাকে এবং সেটা বিনা বিতর্কে। কিন্তু আমাদের এমন দুর্ভাগ্য যে দেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যকটি সুপরিকল্পনাকে ধর্মের গোড়ামির বিতর্কের চাদরে ঢেকে দেওয়ার এক অপ্রত্যাশিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় সেটা সিএএ হোক, এনআরসি, এনপিআর কিংবা পরিবার পরিকল্পনাই হোক না কেন। তবে দেশের বিরোধী দলগুলি যখন বিশেষ এক ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতি দুর্বল তখন দেশের অভিভাবক প্রধানমন্ত্রীকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে তো সাহসী কোনো পদক্ষেপ নিতেই হবে।

রাজনীতির বিভ্রান্তি ও সঙ্ঘ

অসীম কুমার মিত্র

রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারতীয় জনতা পার্টি দেশের এক নম্বর দল হিসেবে নিজের জায়গা করে নেবার পর থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের গুরুত্ব খুব বেড়ে গেছে বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ঘটনা একেবারে উলটো— অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠিত শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার ফলেই রাজনীতির ক্ষেত্রে বিজেপির রমরমা এত বেড়েছে। আমার মনে হয় একথা বলাও বোধহয় সম্পূর্ণরূপে সঠিক নয়। কারণ তাহলে এমন মনে হতে পারে যে ভারতীয় জনতা পার্টি বুঝি আরএসএসেরই রাজনৈতিক ফ্রন্ট। আদতে তা কিন্তু নয়। ভারতীয় জনতা পার্টি একটি স্বতন্ত্র সংস্থা। রাজনীতির ক্ষেত্রই হলো তার কাজ করার জায়গা। সেখানে সমগ্র ভারতবর্ষে সকলের মধ্যে তার গতিবিধি। একটি পৃথক সংস্থা হিসেবে তার নিজস্ব কর্মসূচির ভিত্তিতে এই দল বেড়ে উঠেছে।

একথা যেমন সত্য— তেমনি একথাও সত্য, যে হিন্দুত্বের আদর্শের কথা আরএসএস বলে থাকে সেই একই আদর্শের কথা বিজেপিও বলে থাকে। অপর দিকে আরএসএস কোনো রাজনৈতিক দল নয়। কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের একটা রাজনৈতিক ভূমিকা আছে। এই ভূমিকার অভিব্যক্তি তারা কী প্রকারে ঘটাবে? এমনিতে সঙ্ঘের তরফে একথা স্পষ্ট ভাবে বলা আছে যে, সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের রাজনৈতিক ভূমিকা কী হবে বা না হবে সেটা স্থির করার মালিক তারা নিজেরাই। অর্থাৎ নিজেদের রাজনৈতিক ভূমিকা নির্ধারণের ব্যাপারে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা স্বাধীন।

তাছাড়া সঙ্ঘ যেহেতু সামগ্রিকভাবে দেশের চিন্তা করে এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে থাকে, সেই হেতু তাদের কর্মক্ষেত্রের আওতা থেকে কোনো রাজনৈতিক দলই বাদ নয়। ষাটের দশকের কথা। হাওড়ার কল্যাণগড়ে গ্রীষ্মকালীন সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীকে যুগান্তর পত্রিকার এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, ''আপনারা তো জনসঙ্ঘকে (তখন বিজেপির জন্ম হয়নি। জনসঙ্ঘ নামেই পরিচিত ছিল ওই দল) নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই নয় কী?'' শ্রীগুরুজী চটজলদি জবাব দেন, ''শুধু জনসঙ্ঘ কেন? আমরা তো কংগ্রেস সমেত সব দলকেই নিয়ন্ত্রণ করতে চাই।'' এই কথার অন্তর্নিহিত অর্থ হলো, সঙ্ঘের আদর্শ বা তদর্থে এদেশের নিজস্ব হিন্দুত্বের আদর্শ দ্বারা সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হবে। আরএসএসও সেই অর্থে একটি ক্ষুদ্র দলীয় গণ্ডিতে সীমিত না থেকে সমগ্র দেশের সব রকম গতিবৃদ্ধির মূলে 'কনসেন্স কিপার' বা দেশের বিবেককে উজ্জীবিত রাখার

কাজ করে যাবে নিরলসভাবে।

তাই যদি হয় তাহলে আরএসএস-কে একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বেঁধে ফেলা হলো কোন যুক্তিতে? বিরোধী দলগুলি অর্থাৎ যারা এদেশের হিন্দুত্ববাদী চরিত্রের বিরোধী তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে একটা দুরভিসন্ধি কাজ করে থাকে। এই দুরভিসন্ধির কারণটা যে কী তা বুঝতে খুব একটা ভুল হবার কথা নয়। কিন্তু একশ্রেণীর স্বয়ংসেবকও বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে রাজনীতি ক্ষেত্রে বিজেপি হলো একমাত্র দল যাদের বাড়বাড়ন্ত শুধু স্বয়ংসেবদেরই জন্য। যেন অন্য দলগুলিকে হিন্দুত্বের আদর্শে আনার কোনো দায়ই আমাদের নেই। মনে রাখতে হবে যে, দেশের মানসিকতা পরিবর্তন শুধুমাত্র রাজনীতির মাধ্যমে আনা সম্ভব নয়। তার জন্য চাই দেশের মানুষের মধ্যে দেশাত্মবোধ সৃষ্টি করা এবং দেশমাতৃকার প্রতি তাদের সন্তানবৎ আচরণের যৌক্তিকতাকে প্রতিষ্ঠা করা। আরএসএস হিন্দুত্বের আদর্শের ভিত্তিতে সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়।

তবু স্বয়ংসেবকদের মনে বিজেপি সম্পর্কে যে ভ্রান্তি বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে আছে একটি অন্য কারণ। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের স্বাগত জানানো তো দূরের কথা, তাদের দূরছাই করে তাড়াতে পারলেই যেন তারা বেঁচে যায়। একমাত্র রাজনৈতিক দল জনসঙ্ঘ বর্তমানে বিজেপিই তাদের তাড়ালো না-ই, বরং তাদের গ্রহণ করল এবং তাদের কথা শুনলোও। হিন্দুত্বের আদর্শ-সহ অন্যান্য বহু ব্যাপারে তারা ভারতের মৌলিক ভূমিকার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করল নির্দ্বিধায়। এই সূত্রে দেখা দিল দুটি বিভ্রান্তি। বিজেপির কতিপয় কর্মী মনে করতে লাগলেন যে তারা যা করবেন আরএসএস তার প্রতি দ্বিধাহীন সমর্থন জানাবে। অন্যদিকে এক শ্রেণীর স্বয়ংসেবক মনে করতে লাগলেন যে তাদের শক্তিতেই বিজেপি আজ এত শক্তিশালী। অতএব আমরা যা বলব বিজেপি তা করতে বাধ্য। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হলো উপরোক্ত দুই ধরনের মানসিকতাই একান্তভাবে ভ্রান্ত। অন্যদিকে হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে যে শক্তিগুলি কাজ করছে তারা এই উভয় মানসিকতার গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে, উস্কে দিয়ে, প্ররোচিত করে দুটি সংগঠনকে সম্মুখ সমরে নামিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এ বিষয়ে সচেতন হওয়া দেশের স্বার্থেই আজ বিশেষ প্রয়োজন। স্বয়ংসেবক অথবা বিজেপির সদস্য উভয়কেই বুঝতে হবে যে হিন্দুত্ব বিরোধীরা এই সূত্রে এক খুড়োর কল পেতেছে যাতে পা পড়লে এগোতে বা পিছোতে গেলে দু'দিকেই এই ফাঁদ কাজ করে। তাই বলে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, রাজনীতির এক্তিয়ার একটা সীমানা পর্যন্ত বাঁধা। অন্যদিকে রাজনীতির বাইরে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের ক্ষেত্র সর্বব্যাপী যার ভেতর রাজনীতিও আসে। এবার স্বয়ংসেবক পরিচালিত ধর্মীয় সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ যদি রাম মন্দির নির্মাণের কথা বলেন, তাতে অন্যায় কোথায়? হিন্দুদের দেশ হিন্দুস্থানে রামমন্দির না হলে কোথায় হবে? সুতরাং শাসন ক্ষমতায় যে দলই থাকুক না কেন দেশের মানুষের মনোভাবকে সমীহ করে চলাই হলো শাসকদলের কাজ। স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ সম্পর্কেও ওই এক কথা। আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের স্বার্থরক্ষায় তারা কর্মরত। অর্থনীতির উদারীকরণের অর্থ যদি ভারতকে পাশ্চাত্যের উদরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাহলে তাকে নিশ্চয়ই স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ সমর্থন করতে পারে না।

এই সূত্রেই প্রশ্ন উঠেছে বা বলা উচিত প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ প্রভৃতি সংগঠনের যারা কেন্দ্রের বিজেপি পরিচালিত সরকারের কতিপয় নীতির সামালোচনা করছেন তারাও স্বয়ংসেবক। সেক্ষেত্রে এটাকে কী পরস্পর বিরোধিতা বলা উচিত হবে না? না, তার কারণ প্রথম কথা কেন্দ্রের সরকার শুধুমাত্র বিজেপি সরকার নয়, সেখানে অন্যান্য দলও আছে। তাদের একটা কর্মসূচিও আছে। সেই অনুযায়ী কাজ করতে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দ্বিতীয় কথা হলো, মেকি ধর্মনিরপেক্ষতাকে আমল না দিলেও প্রকৃত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ নীতিকে সমীহ করতেই হয়। তবু সরকার যদি ভুল করে তাহলে সে ভুল শুধরে দেবে কে? জনগণ। কারণ গণতন্ত্রে সরকার বড়ো নয়, বড়ো হলো জনগণ। যে কোনো বিষয়ে শেষ কথা বলে তারাই। এতে পরস্পর বিরোধিতার কোনো ব্যাপার নেই।

একথা অনস্বীকার্য যে, রাজনৈতিক দলকে ভোটের কথা ভাবতেই হয় এবং সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আরএসএস তো আর রাজনৈতিক দল নয়, তাই তার চিন্তা রাজনৈতিক দল থেকে পৃথক হতে বাধ্য। প্রকৃত মানুষ গড়ার কাজে তাদের একমাত্র আরাধ্যা দেবী দেশজননী। এবং আরও স্পষ্ট করে আরএসএস থেকে বলা হয়েছে যে, যারা ভারতমাতাকে মা বলে মনেপ্রাণে স্বীকার করবে এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মায়ের প্রতি কর্তব্য পালনে সদা প্রস্তুত থাকবে— তারা সকলেই হিন্দু। সে তার ধর্ম বা উপাসনা পদ্ধতি যাই হোক না কেন ভারতের মুসলমান, খ্রিস্টান, ইহুদি প্রভৃতি সকলেই হিন্দু। হিন্দুস্থানে যাদের বাস তারা সকলেই হিন্দু। এটা শুধু বিশ্বাস নয়, ঘটনা। মক্কায় হজ করতে যেসব মুসলমান ভারত থেকে যান তাদের নাম পঞ্জীকৃত হয় হিন্দু হিসেবে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টি ছিল খুব পরিষ্কার। তাই তিনি লিখেছেন এদেশে আমরা সকলেই হিন্দু, আমি হিন্দু-ব্রাহ্মণ, আমি হিন্দু-খ্রিস্টান অথবা আমি হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি। শ্রীগুরুজী কলকাতার মনুমেন্ট ময়দানে সত্তরের দশকের গোড়ায় প্রদত্ত এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, ওরা যদি ভারতমাকে মা বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতো তাহলে তারা মায়ের অঙ্গচ্ছেদ করে পাকিস্তান সৃষ্টি করতো না, ভারতবর্ষের মধ্যেই মুসলমান প্রধান একটি প্রদেশ চাইতে পারত। যেমন বিহারি প্রধান বিহার, ওড়িয়া প্রধান ওড়িশা ইত্যাদি। তেমনি মুসলমান প্রধান একটি প্রদেশ হতেই পারত।

মোদ্দা কথা হলো, দেশের প্রতি আনুগত্য। সেখানে ফাটল থাকলে দেশ বাঁচতে পারে না। আর দেশ না বাঁচলে কীসের রাজনীতি আর কীসের অর্থনীতি। আরএসএস-এর বর্তমান সরসঙ্ঘচালক শ্রীসুদর্শন তাই দেশের মুসলমান ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সঙ্গে বার বার মিলিত হয়ে কাথাবার্তা বলছেন যাতে এই দেশের জলবায়ুতে বড়ো হয়ে অন্য দেশের প্রতি আনুগত্য রাখার মতো বিশ্বাসঘাতকতা তারা না করে। আরএসএস-এর এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হবে। তাহলেই দেখা যাবে কোথাও কোনো বিভ্রান্তি নেই, তা সে অপপ্রচারকারীরা মিথ্যার ঢক্কা যতই নিনাদ করুন না কেন।

(২০০৩ সালের জাগরণ পত্রিকায় প্রকাশিত)

দাঙ্গার নেপথ্য কুশীলব বামপন্থী এবং অতিবামপন্থীরা

যারা একটা মানুষকে মারতে চারশোবার ছোরা চালিয়েছে তাদের বাঘের পরিবারভুক্ত বলে সম্মান জানালে তা হবে হাস্যকর। আসলে ওই নপুংসকের দল ইঁদুরের মতোই। অন্ধকার জগতের জীব। মাঝে মাঝে গর্ত থেকে উঁকি মেরে মানুষের সর্বনাশ করে ফের লুকোয় গর্তে। কারা এরা?

সুজিত রায়

'দ্য ক্যাট ইজ আউট অফ দ্য ব্যাগ!' অতি পুরাতন একটি প্রবাদ বাক্য। সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রবাদ বাক্যটি বেদবাক্যের মতোই সত্য। সেই সত্য এবার প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। হ্যাঁ, দিল্লির দাঙ্গা তথা ভয়াবহ গণহত্যার ঘটনার নেপথ্য কুশীলবদের পরিচয় প্রকাশ্যে আসছে একের পর এক। পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে চিত্রটা প্রতিদিন— নৃশংস হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর, পেট্রোল বোমা এবং পাথরবাজির আস্ফালনের ষড়যন্ত্র তত্ত্বের শিকড় কত গভীরে। দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনগুলি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। অঙ্কের মতো মিলে যাচ্ছে দু'মাস আগের ঘটে যাওয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রক্তচক্ষু রঞ্জিত রেললাইন ওপড়ানোর আন্দোলনও কোনও সাময়িক ঘটনা ছিল না। কোনোটাই ছিল না দুর্ঘটনা এবং প্রতিটি ঘটনার পিছনেই ছিল একটা রাজনৈতিক শক্তি যারা বহু বছর আগেই সন্ত্রাসকে মূলধন করে অর্থগৃধ্নু রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরেছিল অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদে। তারা নিজেদের মেরুদণ্ড বিকিয়ে দিয়েছিল অর্থের কাছে নিজেদের মস্তিষ্কগুলোকে বন্ধক দিয়ে। আর পশ্চিমবঙ্গে ডেকে এনেছিল এক কালান্তক রাজনীতিকে যার শিকড় আজ গোটা দেশ তো বটেই, রেহাই দেয়নি রাজধানী দিল্লিকেও।

এরা কারা? কী এদের পরিচয় উদ্দেশ্যই বা কী?

সে কথায় যাবার আগে আসুন দেখে নিই কতকগুলো তথ্য যা সোশ্যাল মিডিয়ায় গত কয়েকদিন ধরে প্রকাশিত হয়ে চলেছে একের পর এক। লোকের হাতে হাতে মোবাইলের স্ক্রিনে ফুটে উঠছে সেই ভয়ংকর সত্য এবং মানুষের মুখে মুখে ঘুরছে সেই প্রবাদবাক্য— 'দ্য ক্যাট ইজ আউট অব দ্য ব্যাগ।' অনেকেই রসিকতা করে বলছেন, ক্যাট নয়। ওটা আসলে র‍্যাট। অর্থাৎ দ্য র‍্যাট ইজ আউট অব দ্য ব্যাগ। বলছেন, কারণ দিল্লির ভয়াবহ দাঙ্গার নকশা যাঁরা করেছিলেন তাঁরা ক্যাট হতে পারেন না। বেড়াল যত ছোটোই হোক না কেন, বাঘের পরিবারভুক্ত। দাঙ্গা যারা করেছে, যারা একটা মানুষকে মারতে চারশোবার ছোরা চালিয়েছে তাদের বাঘের পরিবারভুক্ত বলে সম্মান জানালে তা হবে হাস্যকর। আসলে ওই নপুংসকের দল ইঁদুরের মতোই। অন্ধকার জগতের জীব। মাঝে মাঝে গর্ত থেকে উঁকি মেরে মানুষের সর্বনাশ করে ফের লুকোয় গর্তে। কারা এরা? আসুন দেখি :

সত্য : ১। কিছুদিন আগেই টেলিভিশনের কল্যাণে গোটা দেশ চিনে গিয়েছিল এক দেশদ্রোহিনীকে। তার নাম অমূল্য লিওনা নরনহা। কর্ণাটকে অনুষ্ঠিত

অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসমিলি নেতা আসাদুদ্দিন ওয়াইসির নাগরিকত্ব আইন বিরোধী এক জনসমাবেশে কেরল নিবাসিনী ওই মহিলা অমূল্য স্লোগান তুলেছিলেন, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ।' তার হাত থেকে মাইক কেড়ে নিয়ে নিজেকে নির্ভেজাল ভারতীয় প্রমাণ করার নাটক করেছিলেন আসাদুদ্দিন। অমূল্যও পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য 'হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু না, বাঁচেননি। পুলিশি হেফাজতে তিনি কী জবানবন্দি দিয়েছেন?

শুনুন তাহলে। ১৪ দিনের জেল হেফাজতে থাকা ওই দেশবিরোধী মহিলা কবুল করেছেন, নাগরিকত্ব আইন বিরোধী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাঁকে দু' লক্ষ টাকা দিয়েছে ওই আইনের বিরুদ্ধে একটি টিম তৈরি করতে। ওই সংগঠনগুলিই তাঁর এবং তাঁর দলের সঙ্গীদের যাবতীয় খরচের দায়ভার বহন করে। ওইসব সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানগুলিই জনসমাবেশে কী বলতে হবে, কীভাবে উস্কানি দিতে হবে, কীভাবে ভুল বোঝাতে হবে তার প্রশিক্ষণ দেয় এবং জনসমাবেশে বলার জন্য ভাষাও লিখে দেয়। অমূল্য ফাঁস করে দিয়েছে, ভাষণ, বক্তব্য, স্লোগান ইত্যাদি লেখার জন্য একদল দক্ষ কনটেন্ট রাইটার রয়েছেন যাঁরা সকলেই বামপন্থী এবং অতিবামপন্থী দলভুক্ত। এরা কেউ উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করে, কেউ ভাষণের খসড়া তৈরি করে, কেউ মাঠে ময়দানে ঘুরে খবরাখবর সংগ্রহ করে। তাঁদের অধীনস্থ হিসেবে তিনি এবং তাঁর টিমের সদস্যরা জনমত সংগঠিত করে এবং এই কাজে তাঁর নিজের বাবা-মাও যুক্ত রয়েছেন। উল্লেখ্য, অমূল্যকে পুলিশ গ্রেপ্তারের পর তার বাবা বিবৃতি দিয়েছেন, অমূল্য একটি ইসলামি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। অনেক বারণ করা সত্ত্বেও অমূল্য নাকি তাঁদের কথা শোনেননি। কিন্তু অমূল্যর বক্তব্য প্রমাণ করে, তাঁর বাবাও মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছেন। এবং এঁরা সকলেই বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত।

২। দিল্লির শাহিনবাগে প্রায় গত তিনমাস ধরে দীর্ঘ পথ অবরোধ করে যারা বসে আছেন সেই নারী-পুরুষ সকলেই কেন এই কষ্টসাধন করছেন? বেশ কয়েকটি ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন মিডিয়ার সাক্ষাৎকারে তাঁরা স্বীকার করেছেন, তাঁর শাহিনবাগে ধরনার জন্য টাকা পাচ্ছেন। প্রতিদিন বিরিয়ানির প্যাকেট পাচ্ছেন। প্রতিদিন কেউ রোজগার করছেন ৫০০ টাকা। কেউ ৮০০ টাকা। কেউ ১২০০ টাকা। কে জোগাচ্ছে টাকা। অশিক্ষিত নিরুপায় সংখ্যালঘু মানুষগুলো জানে না, এত টাকা কোথা থেকে আসছে। তাঁদের হাতে প্রতিদিন লাইন করে যারা টাকা তুলে দিচ্ছেন, তাঁরা বলেছেন, টাকা জোগাচ্ছেন আল্লা। কোনো ইনসান টাকা জোগাচ্ছে না। এই সব আল্লাও নাকি বামপন্থী আল্লা এবং এরা সকলেই মুসলমান। এদের হাতে প্রতিদিন কোনো এক সুড়ঙ্গপথে পৌঁছে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা। নগদে যা তারা প্রতিদিন বিলি করে যাচ্ছেন ধরনাকারীদের মধ্যে।

৩। দিল্লির দাঙ্গার পিছনে মূল কালো হাতটি যার বলে অভিযোগ সেই আম আদমি পার্টি নেতা তাহির হুসেইন দাঙ্গার দিন প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাঁর বাড়ি কে বা কারা দখল করেছিল, তা তিনি জানেন না। ঘটনার সময় তিনি বাড়িতেও ছিলেন না। কিন্তু প্রকাশ্যে চলে আসা ভিডিয়ো ক্লিপিংসে দেখা যাচ্ছে, তাঁর উপস্থিতিতেই তাঁর বাড়ির ছাদ থেকে পাথর ছোঁড়া হচ্ছে। খোলা রাস্তায় আমজনতার ওপর ছোঁড়া হচ্ছে পেট্রোল বোমা। পুলিশের তদন্ত চলাকালীন দেখা যাচ্ছে, ছাদময় ছড়িয়ে পেট্রোল বোমা ভর্তি একাধিক ক্রেট। অজস্র ইট এবং পাথরের টুকরো। আর সমস্ত আক্রমণটি পরিচালনা করছেন একটি লাঠি হাতে নিয়ে তাহির হুসেইন স্বয়ং। বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র অভিযোগ করেছেন, আইবি অফিসার অঙ্কিত শর্মাকে খুন করেছেন তাহির হুসেইনই। এছাড়া আরও তিনজনকে খুন করেছেন তাহির অত্যন্ত নৃশংসভাবে। তাঁকে সাহায্য করেছেন বেশ কয়েকজন জেহাদি যুবক যারা সকলেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত।

৪। দাঙ্গায় ভয়ংকরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মুস্তফাবাদ, করাবল নগর, চমন পার্ক, শিববিহারের মতো এলাকাগুলির বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বাড়িতে ট্রাক্টরে করে ইট বয়ে আনা হচ্ছিল বিভিন্ন ইটভাটা থেকে। প্রকাশ্যে বলা হচ্ছিল, নির্মাণকাজের জন্যই ইট আনা হয়েছিল। কিন্তু দাঙ্গার সময় লক্ষ্য করা গেছে, বিভিন্ন বাড়ির ছাদে সংগৃহীত ওই ইটগুলিকেই ব্যবহার করা হয়েছিল দাঙ্গায় বিরোধীপক্ষের ওপর আক্রমণ হানতে। ইটের আঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন বা গুরুতর আহত হয়েছেন বহু মানুষ যাঁদের বেশিরভাগই অমুসলমান। এদের কয়েকজনের অবস্থা সংকটজনক।

৫। আউটলুক ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত জীবনপ্রকাশ শর্মার একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে, দাঙ্গার অনন্ত মাসখানেক আগে থেকেই 'পিঞ্জরা তোড়' বা 'খাঁচা ভাঙা' নামে একটি ছাত্রী সংগঠন দিল্লির বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ, মিছিল, ধরনার আয়োজন করেছিল। ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে ১২ জানুয়ারি ২০২০-র মধ্যে সংগঠনটি বেশ কয়েকটি মোমবাতি মিছিলও বার করে। জানুয়ারি মাসেই তারা সিলমপুর, খাজৌরী খাস, কদমপুরী, চাঁদবাগ-সহ বিভিন্ন অঞ্চলে সাময়িকভাবে হলেও শাহিনবাগের কায়দায় মুসলমান মহিলাদের ধরনা অবস্থানে বসিয়ে দিয়েছিল। এই পিঞ্জরা তোড় নামক সংগঠনটি বিভিন্ন এলাকায় এমন অশান্তি সৃষ্টি করছিল যে সংখ্যাগুরু হিন্দুরাও ভীত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। স্থানীয় এক মুসলমান মহিলাও বিবৃতি দিয়েছেন, সংগঠনটির সদস্যারা কেউ স্থানীয় বাসিন্দা নন। এরা সকলেই একটি অতিবাম সংগঠনের সদস্য যারা স্থানীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ভারত সরকার, বিজেপি এবং হিন্দু বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়ে যাচ্ছিল। ওই মহিলার স্পষ্ট বক্তব্য, ১৯৯২ সালে বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের পর হিন্দু-মুসলমান সংঘাত হয়েছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার পুরনো সম্পর্ক ফিরে এসেছিল। সেই সুস্থ পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলে পিঞ্জরা তোড় নামক সংগঠনের অতিবাম সদস্যরাই। এদের উদ্যোগেই দাঙ্গার দিনগুলোতে সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুদের

ওপর অবিরাম হামলা চালিয়ে গেছে।

৬। দাঙ্গা শুরু হওয়ার বেশ কিছুদিন আগে থেকে বিভিন্ন ইসলামিক ধর্মগুরু এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উস্কানিমূলক বিবৃতি দিচ্ছিলেন। এসবের পাশাপাশি বাংলাদেশের বিভিন্ন ইসলামিক ধর্মীয় নেতারা এমনকী বেশ কিছু সাহিত্যপ্রেমী মুসলমান তরুণ-তরুণীও ফেসবুক এবং ট্যুইটারের মাধ্যমে হিন্দু-বিরোধী প্রচার চালাচ্ছিল তীব্র গতিতে। কখনও তা লাইভ অডিয়ো-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে, কখনও বা কবিতা ও ছড়ায়। এই সমস্ত প্রচারগুলিই প্রমাণ করছে, দাঙ্গা পূর্ববর্তী পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করতে একটি সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল পূর্ব পরিকল্পিত ভাবেই, যার ফলাফল দিল্লির নৃশংস দাঙ্গা এবং কমবেশি ৫০ জনের মৃত্যু। অজস্র মানুষ আহত এবং নিখোঁজ। হয়তো বা মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তেই থাকবে আরও কিছুদিন। তারপরও চলবে চোরাগোপ্তা হত্যালীলা।

এই কয়েকটি সত্য একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, দেশের অভ্যন্তরে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করে তুলতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দাবার বোর্ডের 'বোড়ে' হিসেবে ব্যবহার করেছে কিছু বামশক্তি এবং কিছু ইসলামিক ধর্মীয় সংগঠন ও নেতৃবৃন্দ। বামপন্থিদের অবদানই বেশি, কারণ বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি এখন ভুগছে অস্তিত্বের সংকটে। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে মাওবাদী নেতা কিষেনজীর মৃত্যুর পর গোটা ভারতবর্ষের অতি বামপন্থীদের 'টাকা আদায়'-এর ব্যবসাটা বেশ বড়ো রকমে ধাক্কা খেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মাওবাদী দলগুলিতে নাম লেখানো তরুণ-তরুণীদের অনেকেই এখন শুধুমাত্র পেটভাতায় কাজ খুঁজতেও নেমে পড়েছে। এরকম একটা পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়েছে আন্তর্জাতিক স্তরের সন্ত্রাসবাদী মুসলমান সংগঠনগুলি যারা পাকিস্তানে মদতে যে কোনো পথে ভারতের সর্বনাশ করতে উদ্যত। এরাই বামপন্থী ও অতি বামপন্থী সংগঠনগুলির হাতে মুঠো মুঠো টাকা তুলে দিচ্ছে। এরকম ঘটনা যে এই প্রথম ঘটছে তা নয়। ২০০৯ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা থেকে বামপন্থীদের হঠাতে দেশি বিদেশি অর্থের জোগানদারদের মদতে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। কৃষকরা নয়, সিঙ্গুরের আন্দোলনে কৃষকের মুখোশ ছিল এই মাওবাদীরাই। নন্দীগ্রামের জনঅভ্যুত্থানের নেপথ্য কারিগরও ছিল মাওবাদীরাই। এরাই গোটা জঙ্গলমহলকে তুলে দিয়েছিল বাম-বিরোধী মূল রাজনৈতিক শক্তি তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে।

কিষেনজীর মৃত্যুর পর মনে হয়েছিল, মাওবাদীরা হয়তো নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু না রক্তবীজদের আয়ু এত সহজে শেষ হয় না। যেই '৭১ সাল থেকে নকশালবাদীদের উত্থান থেকে শুরু করে আজকের 'পিঞ্জরা তোড়' সংগঠন অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাসবাদ মানবতাবাদের মুখোশ পরে। বেশ কিছু মানবাধিকার সংগঠনও হয়তো মিলেমিশে রয়েছে ওদের সঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গই এদের পোলট্রি ফার্ম। এখান থেকেই শক্তি সঞ্চয় করে এরা গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং নাগরিকত্ব আইন চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এরা সংখ্যালঘুদের নিয়ে রাজনীতি করতে নেমে পড়েছে। কারণ সংখ্যালঘু সংগঠনগুলির হাতে রয়েছে প্রচুর

ভিডিয়োতে দেখা গেছে শার্জিল মুসলমান জনসমাবেশে উত্তেজক বক্তৃতা দিচ্ছেন। প্রকাশ্যে বলছেন ভারতের সংবিধানের সঙ্গে এদেশের মুসলমানদের কোনও সম্পর্ক নেই। ভারতে সংবিধান তখনই মুসলমানদের হবে যখন মুসলমানরা আলাদা সংবিধান প্রণয়ন করবে। সিএএ নিয়ে তিনি বলছেন, 'মুসলমানদের ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হবে। আপনারা ভাবছেন সিএএ সংবিধানের ওপর আঘাত। ব্যাপারটা তা নয়। এই আইন আসলে মুসলমানদের ওপর আঘাত। আপনারা জানেন বাবরি মসজিদ মামলায় আদালত কী করেছে। আপনারা এও জানেন কাশ্মীর নিয়ে আদালত কী করেছে। এরপর সংবিধানের কাছ থেকে আপনারা কী আশা করতে পারেন?'

৩১ ডিসেম্বর ওপি ইন্ডিয়া নামের একটি গণমাধ্যম শার্জিল ইমামের হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজের কয়েকটি স্ক্রিনশট প্রকাশ করে। তাতে শার্জিল অযোধ্যা মামলার ১৫০০ পাতার রায় পুড়িয়ে ফেলা সম্ভব নয় বলে ভারতের সংবিধান পুড়িয়ে ফেলার আবেদন জানান। এর আগে, ১৪ ডিসেম্বর তিনি মুসলমানদের দিল্লির সব রাস্তা বন্ধ করে দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। যাতে দাঙ্গা বাঁধলে হিন্দুরা দিল্লির বাইরে যেতে না পারে। শার্জিলের উপস্থিতিতেই শাহিনবাগে 'জিন্নাহ্‌ওয়ালি আজাদি'র স্লোগান দেওয়া হয়েছিল।

দাঙ্গার পরিকল্পনা করার সময় শার্জিল পাশে পেয়েছিলেন আম আদমি পার্টির নেতাদের। শার্জিলের সঙ্গে আপ নেতা আমানুতুল্লাহ্ খানের ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়ে গেছে। দিল্লিতে আপকে জিততে সাহায্য করেছে শাহিনবাগ। তাই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে একটিও এফআইআর করেনি কেজরিওয়াল সরকার।

কাঁচা টাকা। সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গে ভয়ংকর সন্ত্রাসী চেহারা নেওয়া রাজ্যপাল বিরোধী ছাত্র আন্দোলনগুলিও যে ওই কাঁচা টাকায় মদতপুষ্ট তা বোধহয় বলার অবকাশ রাখে না। আগামীদিনে বামপন্থী, অতি বামপন্থী এবং সংখ্যালঘু সংগঠনগুলির সঙ্ঘবদ্ধ সন্ত্রাস হয়তো আরও ভয়াবহ চেহারা নেবে। দিল্লির মতো সন্ত্রাসী দাঙ্গার শিকার হবে আরও অন্যান্য রাজ্যও, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরলের মতো রাজ্যগুলি যেখানে বামশক্তি একদা ক্ষমতার অলিন্দে দিনাতিপাত করেছে। সহজে সেই ক্ষমতার আস্বাদ ফিরে পাবার সুযোগ তারা হারাতে চাইবে না। দাঙ্গার নেপথ্য কারিগর হিসেবে বামপন্থীদের এই বিশ্বাসঘাতকতার ভূমিকা নতুন কিছু নয়। স্বাধীনতার আগে ও পরে, বিশেষ করে কাশ্মীরের রাজনীতিতে পাকিস্তানপন্থী মনোভাব নিয়ে বামপন্থীদের বিভিন্ন পদক্ষেপের ইতিহাস আরও লেখা রয়েছে কালো অক্ষরে। কিন্তু সংখ্যালঘুদের নিয়ে এমন রাজনীতি, তাও শুধু অর্থের লোভে, এর আগে দেখা যায়নি।

সামনে ঘন অন্ধকার। অতএব এখন থেকেই সার্বিক জনগণকে সাবধান হতে হবে। বুঝতে হবে, যতই সংখ্যালঘুরা দাবি করুক না কেন, দাঙ্গা হয়েছে বিজেপি তথা আর এস এসের প্রত্যক্ষ মদতে, বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে তা মেনে নেওয়া যাবে না। কারণ তা যদি সত্যিই হতো, তাহলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা বেশি হতো। হিন্দুদের মরতে হতো না। হাসপাতালে আহতের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা বেশি হতো না। যে পরিমাণ ভিডিয়ো চিত্র সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে মিলেছে, তার একাংশও মেলেনি হিন্দু আক্রমণের। আক্রমণ হলে প্রতি আক্রমণ স্বাভাবিক। সেই প্রতি-আক্রমণ বা আত্মরক্ষার্থেই হিন্দুরা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল সাময়িকভাবে। তাতে কিছু সংখ্যালঘুও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন নিশ্চয়ই। যে কোনো মানুষের মৃত্যুই দুঃখের। কোনো দাঙ্গাই মানুষের মঙ্গল করে না— এই বাস্তবোচিত ভাবনাগুলো এখন বেশি করে ভাবতে হবে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে। বামপন্থী এবং অতি বামপন্থী রাজনীতির এই সন্ত্রাসী ভূমিকা নিন্দা করতে হবে সঙ্ঘবদ্ধভাবে এবং দেশের সংবিধান রক্ষার স্বার্থে, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে দেশের হিন্দুবাদী ঐতিহ্য রক্ষার স্বার্থে রাশিয়া এবং চীনের দালালদের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে ভারতবর্ষকে। এখন তো আবার ওই দলগুলি আইএসেরও দালালি করতে পথে নেমেছে। রাজনীতির এই সন্ত্রাসী রূপ থেকে ভারতকে রক্ষা করা একক ভাবে কোনো দল বা কোনো সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষকে সত্য জেনে, সত্য বিশ্লেষণ করে দেশের স্বার্থে এগিয়ে আসতে হবে। তবে জেহাদি শক্তির হাত থেকে বাঁচবে ভারত, বাঁচবে ভারতবর্ষ।

ইনি অতিবাম নেত্রী অমূল্যা লিওন। সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (মিম) প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়েসি আয়োজিত সিএএ বিরোধী এক প্রতিবাদ মঞ্চে উঠে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দেন। 'সেভ কনস্টিটিউশন' নামের ব্যানারে আয়োজিত হয়েছিল এই সভাটি। নিজের বক্তব্য রাখার সময় ওই তরুণী একাধিকবার 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দিয়েছেন এবং তিনি এক পুরানো নকশালবাদী বলে খবরে প্রকাশ। পুলিশ অবশ্য তাকে গ্রেপ্তার করেছে এবং দেশদ্রোহিতা-সহ বিভিন্ন ধারায় তার বিরুদ্ধে রুজু করা হয়েছে মামলাও।

কেন্দ্র কেন চুপ করে ছিল?

একটা প্রশ্ন বার বার উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে— কেন্দ্র কেন চুপ করে ছিল? কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি কেন তথ্য সংগ্রহে ব্যর্থ হলো? কেনই বা প্রায় তিনমাস ধরে শাহিনবাগ ধরনাকে প্রশ্রয় দেওয়া হলো? কেনই বা ধর্মীয় উস্কানিমূলক ভিডিয়োগুলির সম্প্রচারে বাধা দেওয়া হলো না? কেন আজও পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিভিন্ন রাজ্যে সংখ্যালঘুরা অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে নাগরিকত্ব আইন বিরোধী আন্দোলনগুলিকে? কেনই বা আরও বৃহত্তর প্রচারে নামছেন না রাজ্যভিত্তিক বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা? আশা করা যায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যথাসময়ে এই প্রশ্নগুলির জবাব দেবেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ একটা বিষয়ে স্থির এবং অবিচল যে গোটা দেশ জুড়েই নাগরিকত্ব আইন প্রয়োগ হবে যথাযথভাবেই এবং ঠিক সময়েই শুরু হবে নাগরিক পঞ্জীকরণের কাজ। যে অনুপ্রবেশকারী এবং তাঁদের সমর্থনকারীরা দাঙ্গা বাঁধিয়েছে পরিকল্পিতভাবেই এটা প্রমাণ করতে যে তাদের নাগরিকত্বের সমস্ত প্রমাণপত্রগুলি দাঙ্গায় নষ্ট হয়ে গেছে, তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কেউই ক্ষমা পাবেন না। অনুপ্রবেশকারীরা প্রত্যেকেই চিহ্নিত হবেন এবং তাঁদের ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে হবে। কারণ ভারতবর্ষ কোনো ধর্মশালা নয়। ■

চিঠিপত্র

দিল্লিতে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব নৃত্য

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সম্প্রতি ভারত সফরকালে দিল্লিতে কয়েকটি এলাকায় যে তাণ্ডব নৃত্য ঘটেছিল যার ফলে ৪২টি তাজা প্রাণ চলে গেল। কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংস হলো। এই সর্বনাশা কাণ্ডের বীজ রোপণ করা হয়েছিল স্বাধীনতার আগে দেশভাগের মধ্য দিয়েই। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হলো কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে লোক বিনিময় হলো না। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন ধর্মের ভিত্তিতে লোক বিনিময় আমি চিন্তাও করতে পারি না। আর মুসলমানরা যারা বলেছিল মুসলমানদের ধর্ম ও সংস্কৃতি আলাদা। হিন্দুদের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করলে তারা তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রাখতে পারবে না, সুতরাং তাদের একটি নিজস্ব হোমল্যান্ড চাই, তারা তাদের হোমল্যান্ড পাকিস্তান আদায় করে নিল, কিন্তু পাকিস্তানে না গিয়ে ভারতেই বসবাস করতে থাকল অধিক সুযোগ সুবিধে নিয়ে। এখন তারা চাইছে সমগ্র ভারতকে ইসলামিক দেশে পরিণত করতে। তাই ছুতোনাতায়, সামান্য অজুহাতে তারা সারাদেশে অশান্তি সৃষ্টি করছে। সরকারি, বেসরকারি কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংস করছে। এই মাসখানেক আগে পশ্চিমবঙ্গেও সিএএ বিরোধী আন্দোলনে রেল লাইন উপড়ে ফেলে ট্রেনে অগ্নি সংযোগ করে কয়েকশো কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট করল, অথচ কারও কোনও সাজা হলো না। এদের একজন নেতা আবার হুংকার দিয়েছে ভারতের ১৫ কোটি মুসলমান ১০০ শো কোটি হিন্দুর মোকাবিলা করতে সক্ষম অবশ্য এদের মদতদাতা জয়চাঁদদের সংখ্যাও দেশে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবিলম্বে এই বিষবৃক্ষ উৎপাটন করা না হলে অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুদের অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু দেশে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা এ ব্যাপারে ন্যক্কারজনক। নির্বাচনের সময় এদের জোটবদ্ধ ভোট পাওয়ার লালসায় এদের দেশবিরোধী কাজকর্মও সমর্থন করে চলেছে। এই সমস্ত ঘটনাবলীর জন্য এরা হিন্দুদেরই দোষী সাব্যস্ত করে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দাবি করছে, অথচ মুসলমান দুষ্কৃতীদের বিষয়ে মৌনব্রত অবলম্বন করে আছে।

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
বড়বাজার, চন্দননগর।

স্বাধীন ভারতের প্রথম কেলেঙ্কারি

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট, সদ্য দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে একটি দেশকে দ্বিখণ্ডিত করে পাকিস্তান তৈরি হয়েছে। এতে পাকিস্তানে উল্লাস দেখা গেলেও সমগ্র ভারতবর্ষে নেমে আসে এক শোকের আবহ। বিশেষ করে বাঙ্গলা ও পঞ্জাবে তখন এক নিদারণ পরিস্থিতি। ছিন্নমূল, স্বজন হারানো, লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু নারী-পুরুষ-শিশুর হাহাকার। সেই সময় যখন সমস্ত কাজ ফেলে এই স্বজনহারা মানুষদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য লড়াই করা প্রয়োজন। ঠিক তখনই অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ২২ অক্টোবর পাকিস্তান হানা দিল জম্মু ও কাশ্মীর দখলের উদ্দেশ্যে। শুরু হলো দুই দেশের মধ্যে লড়াই এবং সে যুদ্ধ চলতে থাকে ৫ জানুয়ারি ১৯৪৯ অর্থাৎ এক বছর দু' মাসের অধিক সময় ধরে। যখন আমাদের সেনাবাহিনীর বীর জওয়ানরা সদর্পে হঠিয়ে দিচ্ছে পাক হানাদারদের এবং যখন প্রায় চিরতরে অবসান ঘটতে চলেছে ভারত পাক সীমান্ত সমস্যার, ঠিক তখনই বিদেশি শক্তির প্ররোচনায় নেহরুর রাষ্ট্রসঙ্ঘের দ্বারস্থ হওয়া এবং যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এসে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে, এলওসি বা লাইন অব কন্ট্রোল মেনে নেওয়া এক রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয়। বাড়ির কর্তার একটা ভুলে যেমন গোটা পরিবারকে ভুগতে হয়, ঠিক তেমনই দেশের প্রধান বা রাষ্ট্রনায়কের ঐতিহাসিক ভুল সিদ্ধান্তের জন্য আজও ভারতবাসী খেসারত দিয়ে চলেছে। সেই সময় পাকিস্তানি সেনাকে প্রতিহত করতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য জিপ গাড়ি কেনার প্রয়োজন হলে ১৯৪৮ সালে স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে প্রথম প্রতিরক্ষা কেলেঙ্কারি, 'জিপ কেলেঙ্কারি' জনমানসের দৃষ্টিগোচরে আসে। সেই সময়ে ব্রিটেনে ভারতীয় হাই কমিশনার পদে নিযুক্ত থাকা ভি. কে. কৃষ্ণ মেনন প্রোটোকল ভঙ্গ করে সৈন্যবাহিনীর জন্য এক অখ্যাত বিদেশি কোম্পানি 'অ্যান্টি-মিস্টান্টাস'-এর সঙ্গে ২০০টি জিপ ক্রয় করার জন্য ৮০ লক্ষ টাকার এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সময়মতো সম্পূর্ণ দাম মিটিয়ে দেবার পর মাত্র ১৫৫টি জিপ ভারত পায়। আগত ১৫৫টি জিপের মধ্যে কোনোটিই পুনরায় ব্যবহারযাগ্য না থাকায় প্রতিরক্ষামন্ত্রক সেগুলি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। মজার ব্যাপার, জিপগুলি সরবরাহ করা হয় কোনওরকম পরিদর্শন শংসাপত্র ছাড়াই। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সেই সময়কার প্রধানমন্ত্রী গাড়ি গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। পরবর্তীকালে এ আয়ঙ্গারের নেতৃত্বাধীন তদন্ত কমিটির প্রস্তাব অনুসারে বিরোধীরা বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য দাবি জানালে, তৎকালীন সরকার ১৯৫৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর জিপ কেলেঙ্কারি মামলাটি বন্ধ করে। তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জিবি পন্থ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে বলেন, 'যতদূর সরকার উদ্বিগ্ন, তাতে করে সরকার বিষয়টি বন্ধ করার মনস্থ করছে। বিরোধীরা সন্তুষ্ট না হলে তারা এটিকে নির্বাচনের ইস্যুতে পরিণত করতে পারবেন।' এরপরেই ১৯৫৬ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি ভি কে কৃষ্ণ মেননকে পুরস্কার স্বরূপ নেহরু মন্ত্রীসভায় দপ্তরবিহীন মন্ত্রীপদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে তাকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব অর্পণ করা হলে, জিপ কেলেঙ্কারির তদন্ত চিরতরে কাগজের আবর্জনার স্তূপে চির নিদ্রায় চলে যায়। কালের প্রবাহে বিস্মৃতির আড়ালে চলে যায় এই কেলেঙ্কারি।

—ডাঃ বলরাম পাল,
বারুইপাড়া ১ম বাই লেন, হাওড়া।

ভারতের দাঙ্গা বাংলাদেশের অশান্তি !

ভারতের দাঙ্গা নাকি বাংলাদেশের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের বিএনপি দলের মহাসচিব ফখরুল মির্জা উল্লেখ করেছেন, ভারতে নাকি দাঙ্গা চলছে। দাঙ্গা কথার ইংরেজি নাম রায়ট। তবে আমার মনে হয় ফখরুলবাবু দাঙ্গা কাকে বলে এ জানেন না। প্রতিরোধ করাকে কখনোই দাঙ্গায় রূপ দেওয়া যায় না। ভারতবর্ষের অনেক স্থানই বিনা কারণে আটকে রেখে মানুষকে হেনস্থা করা হচ্ছে। বিশেষভাবে শাহিনবাগ এলাকা। এখানে অন্যায় ভাবে হিন্দুদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বাজারে দুধ আনতে গিয়ে মানুষের মৃত্যু ঘটছে। অঙ্কিত শর্মা নামে এক আইবি অফিসারকে মেরে দেওয়া হয়েছে। এটার বেলায় কারোই দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। তবে এটা খুবই স্পষ্ট অহিন্দুরা মেরে যাবে, এদের প্রতিরোধ করাও চলবে না। প্রতিরোধ করলেই দুর্নাম রটানো হবে ভারতে অহিন্দুদের উপর অত্যাচার চলছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের জমিয়তের নেতা নূর হোসেন কাসেমি বলেন, ভারতে নাকি মুসলমানদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হচ্ছে। মুসলমানদের উপাসনালয় আগুন দিয়ে পোড়ানো হচ্ছে। এইসব মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে নিরীহ মানুষদের অযথা খেপিয়ে তোলা হচ্ছে। যাতে করে ভারতকে শত্রুদেশ হিসেবে চিহ্নিত করার সুবিধা হয়। তাঁদের বক্তব্য অনুসারে বাংলাদেশ শান্তির দেশ, ভারতেই যত অশান্তি বিরাজ করছে। নুরবাবুর কথায়, ওরা শান্তিতে বিশ্বাসী, ওখানেই কখনোই অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয় না। ওখানে কেউ কাউকে আক্রমণ করে না। হিন্দুদেরকে ওরা পূজা করেই চলেছে। এদিকে আমরা তো খবর পাচ্ছি প্রতিদিন বাংলাদেশের হিন্দুদের বলা হচ্ছে, ভারতে চলে আসতে। আর নিঃশব্দে চলছে নিরন্তর ধর্মান্তরকরণ। ভারতের মোদী ওদের কাছে এতই বিষ তুল্য— বাংলাদেশ সফরে মোদী গেলে সম্প্রীতি নষ্ট হবে। তাই তারা মোদীকে বাংলাদেশের যাওয়া নিষিদ্ধ করছে। কারণ মোদী নাকি মুসলমানদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে তাদের ভারত ছাড়া করছে। যেটা তারা হিন্দুদের ওপর প্রতিনিয়ত চালাচ্ছে। এই অজুহাতে এবার শুরু হবে ওদের নতুন নাটক। হিন্দুদের তাড়ানোর জন্য এটা হবে ওদের আরেক দফা নতুন কর্মসূচি।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর, নদীয়া।

ব্যতিক্রমী রাজ্যপাল

একেই বলে রাজ্যপাল! তিনি রাজ্যের অধিবাসী হতে পারেন আবার নাও পারেন, রাজ্যের জনপ্রতিনিধি তো অবশ্যই নন, তবে একটা নির্বাচিত সরকারের দ্বারা মনোনীত প্রতিনিধি তিনি। ইংরেজ আমলের তৈরি রাজভবনে থাকবেন সপরিবারে... দুগ্ধ ফেননীভ শয্যা থেকে আরম্ভ করে টিভি, ফ্রিজ, গাড়ি, লাইব্রেরি, ইন্টারনেট, চাকর, আয়া, সান্ত্রী, রাঁধুনি— আধুনিক জীবন যাপনের অশেষ উপকরণ সহযোগে তাঁর অবস্থান। তিনি বিধানসভার অধিবেশন উদ্বোধন করবেন, ঝলমলে পোশাক পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে গিয়ে বেদ থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত উগরে দেবেন, ক্যামেরার ফ্ল্যাশ বারবার ঝলসে উঠবে মুখের ওপর, ফুরফুরে মেজাজে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াবেন বিশাল গাড়ির কনভয় নিয়ে, ভিন রাজ্যের কোনো অতিথি এলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবেন, বিরোধী রাজনৈতিক দল কোনো স্মারকলিপি দিলে তা যত্ন সহকারে গুছিয়ে রাখবেন (না পড়েই)— এই তো কাজ!

মোটামুটি এরকম একটা ধারণার সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়ে আছি।

কিন্তু এতো দেখি উল্টোকাণ্ড। তিনি চেনা রাস্তায় হাঁটতেই চান না। তিনি জগদীপ ধনকড়। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্যপাল। বলেন কিনা রাজ্য ঘুরে ঘুরে তিনি প্রশাসনিক বৈঠক করবেন! রাজ্যের মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন। বিধানসভায় তাঁর পঠিতব্য ভাষণ তিনি আগে পড়ে নেবেন। বিল সই করার আগে তার খুঁটিনাটি তথ্য নেবেন। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে পুলিশের হেড-কর্তার সঙ্গে কথা বলবেন। আসন্ন পৌর-নির্বাচন যেন বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের মতো হিংসাদীর্ণ না হয় তার জন্য সতর্ক করবেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে। রাজ্যের শাসক দল অবশ্য এসবকে ভালো চোখে দেখছেন না, যেমন দেখেননি পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার তৎকালীন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধীকে— নন্দীগ্রামের ঘটনকে 'হাড় হিম করা' বলার জন্য। পরবর্তী রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীকে তৃণমূল সরকার বিজেপির লোক বলে মনে করে। বর্তমান রাজ্যপাল ধনকড় সম্বন্ধে বর্তমান সরকারের মন্তব্য— 'তিনি অতি সক্রিয়'। রাজ্যপাল বলেন, 'আমি সক্রিয়, আমি রাজ্যের সাংবিধানিক অভিভাবক, আমার কর্তব্য সম্বন্ধে আমি সচেতন।' তাই তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রবিক্ষোভে আটকে থাকা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে উদ্ধার করতে সশরীরে হাজির হন। ছাত্র- বিক্ষোভের জন্য তিনি অবশ্য যাদবপুর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ঢুকতে পারেননি। তাতে কী! তারপরেও তিনি পঞ্চানন বর্মা রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে শো-কজ করেছেন। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে রাজ্যপালকে ডাকা হয়নি বলে। একের পর এক তিনি অনেক প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, যেমন--- আচার্য ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন বৈধ কিনা, কোনো রাজনৈতিক ধরনা মঞ্চে উপাচার্যদের থাকা উচিত কিনা, 'আয়ুষ্মান ভারত' বা 'কৃষক সম্মাননা নিধির মতো জনহিতকর প্রকল্পের সুফল থেকে রাজ্যবাসীকে বঞ্চিত করা উচিত কিনা, সংসদে পাশ হওয়া কোনো আইনের বিরুদ্ধে প্রচার চালানোর জন্য কোনো রাজ্য সরকারি টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপন দিতে পারে কিনা— ইত্যাদি।

প্রশ্নগুলো অমূলক নয়। যে কোনো বিবেকবান মানুষকে এগুলো নিয়ে একটু না একটু ভাবতে হয়। 'শুধুই রাজনীতি'— বলে উড়িয়ে দিতে পারেন না।

—অরুণ কুমার ঘোড়ই,
লক্ষ্মীজনার্দনপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

স্টার্ট আপের নতুন উদাহরণ

হরভজন কৌর

সুতপা বসাক ভড়

উদ্যোগপতি আনন্দ মাহিন্দ্রা চুরানব্বই বর্ষীয়া হরভজন কৌরকে 'এন্টারপ্রেন্যুর অব দ্য ইয়ার' ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'সেলিব্রিটি সুইটমেকার' হয়ে গেছেন। বেসনের বরফি বানাবার এত বেশি অর্ডার তাঁর কাছে আসে যে, সেগুলি সময়মতো বানানো তাঁর কাছে অনেকসময় কঠিন হয়ে যায়।

আনন্দ মাহিন্দ্রার একটিমাত্র ট্যুইট চণ্ডীগড়ে বসবাসকারী শ্রীমতী হরভজন কৌরকে সমগ্র দেশে জনপ্রিয় করে তুলেছে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ভি আই পি পর্যন্ত তাঁর বানানো মিষ্টির ভক্ত। সম্প্রতি মাহিন্দ্রা ট্যুইট করে জানিয়েছেন যে, হরভজন কৌরের কাজের প্রতি এই উৎসাহ থেকে আমাদের শেখা উচিত। এজন্য তাঁকে 'এন্টারপ্রেন্যুর অব দ্য ইয়ার' বলতেও তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি।

সত্যি বলতে কী, যে বয়সে সবাইকে শুধুমাত্র বিশ্রাম নিতে বলা হয়, সেই চুরানব্বই বছর বয়সে তিনি যে কোনো যুব উদ্যমীর মতো সম্পূর্ণ উৎসাহের সঙ্গে সক্রিয় আছেন। চণ্ডীগড়ের সেক্টর ৩৬ এর বাসিন্দা হরভজন কৌরের হাতে বানানো মিষ্টি খুবই জনপ্রিয় এবং সুস্বাদু। বিশেষ করে তাঁর তৈরি বেসনের বরফি খুবই লোকপ্রিয়। এখন, তিনি চণ্ডীগড়ে শহরবাসীদের কাছে প্রিয় মিষ্টি নির্মাতা। মিষ্টি ছাড়াও তাঁর হাতে বানানো খাবার এবং চাটনির চাহিদাও দিনে দিনে বেড়ে চলেছে।

হরভজন কৌরের তিন মেয়ে। কয়েকবছর আগে স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি ছোটো মেয়ে রবীনা সুরীর কাছে চণ্ডীগড়ে থাকতে শুরু করেন। রবীনা জানান যে, একদিন কথায় কথায় তিনি তাঁর মাকে তাঁর ইচ্ছার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তাঁর মা বলেন যে, তিনি এই বয়সেও নিজে পরিশ্রম করে কিছু করতে চান। এরপর বাড়ি থেকেই তিনি তাঁর প্রিয় বেসনের বরফি ব্যবসা শুরু করেন। বর্তমানে দু'শোরও বেশি মানুষ তাঁর বানানো মিষ্টি এবং আচারের ভক্ত হয়ে গেছে। এই কাজে রবীনা তাঁর মাকে সবরকমভাবে সাহায্য করেন। নাতি মানব এবং নাতনি মল্লিকাও দিদিমাকে যথাসম্ভব সাহায্য করে থাকে। ৮৫০ টাকা কিলো বেসনের বরফির জন্য তাঁর কাছে সর্বদাই লম্বা অর্ডারের তালিকা থাকে। হরভজন এই ব্যবসার জন্য কোনোরকম মার্কেটিং করেননি। পরিবেশপ্রেমী হরভজন কাগজের বাক্সে মিষ্টি রাখেন। প্যাকেটের ওপর একটি ট্যাগলাইন--- হরভজন্স্।

হরভজন কৌর জানিয়েছেন যে, তাঁর কাছে মিষ্টি বানানোর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র অর্থ উপার্জন নয়, এটি তাঁর ভালোবাসা। আগে শুধুমাত্র পরিবারের সদস্যদের জন্য খাবার বানাতেন, এখন অন্যদের জন্যও তিনি খাবার বানিয়ে চলেছেন। তিনি বলেন যে, বরফি বানানো তিনি তাঁর বাবা স্বর্গীয় জয়রাম সিংহ চাওলার থেকে শিখেছেন। এই বিশেষ মিষ্টি বানানোর পদ্ধতি একশো বছরেরও পুরনো।

প্রত্যেকদিন ভোর পাঁচটার সময় উঠে সব কাজ নিজের হাতে করা তাঁর চিরদিনের অভ্যাস। হাঁটুর অপারেশনও হয়ে গেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে রয়েছে কাজ করার অদম্য প্রচেষ্টা। দিনেরবেলা তিনি অর্ডার দেওয়া মিষ্টি তৈরিতে ব্যস্ত থাকেন। প্রতিটি জিনিস নিজের হাতে বানান। যে কোনো অর্ডার দু'দিনের মধ্যেই বানিয়ে ফেলেন। তাঁর গ্রাহকদের মধ্যে হাইকোর্টের জজ থেকে শুরু করে অনেক গণ্যমান্য লোকজন আছেন। এই বয়সে পৌঁছেও তাঁর উৎসাহ এবং কর্মকুশলতা শিক্ষণীয়!

চুরানব্বই বছর বয়সে পৌঁছেও জীবনের প্রতি এইরকম ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের বিস্মিত এবং অনুপ্রাণিত করে। অনুশাসন প্রিয় এই মহিলা এই বয়সেও স্বনির্ভরশীল এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ। তাঁর জীবনযাপন পদ্ধতি অবশ্যই শিক্ষণীয়। হরভজন কৌরের কথায়, 'কাজ করার কোনো বয়স হয় না, এর জন্য প্রয়োজন কেবলমাত্র ইচ্ছাশক্তি।' ▮

মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধিতে খাদ্যের ভূমিকা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

সব অবিভাবকই নিজের শিশুর উন্নতি চান। পড়াশোনা, খেলাধুলো, নাচ-গান ইত্যাদি সবকিছুতেই সন্তানের পারদর্শিতা কামনা করেন অভিভাবকরা। তবে এর জন্য শিশুর মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

মানুষের মগজের ওজন দেহের মোট ওজনের মাত্র দুই শতাংশ হয়। মগজের সঠিকভাবে কাজ করতে হলে খাদ্য থেকে লাভ করা মোট ক্যালোরির ২০ শতাংশ ক্যালোরি প্রয়োজন হয়। তার পাশাপাশি নিয়মিতভাবে গ্লুকোজের প্রয়োজন হয়। মোট কথা মগজের ঠিকমতো কাজ করতে হলে সঠিক পরিমাণের পুষ্টিকর আহারের প্রয়োজন।

সম্প্রতি এ-সম্পর্কে গবেষকরা জানিয়েছেন, খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মগজ প্রথমেই পুষ্টি উপাদান শুষে নেয়। এক্ষেত্রে কিছু ব্রেইন-ফুড শিশুদের খাওয়ালে মগজের বিকাশ হয়। এতে মগজের কর্মকুশলতা, স্মৃতিশক্তি, মনঃসংযোগ ইত্যাদি ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

১০টি সুপার ব্রেইন ফুড

স্যামন মাছ : এই প্রজাতির মাছে ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, ডিএইচএ এবং ইপিএ থাকে। মগজের বিকাশ এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য এই কটি উপাদান খুবই জরুরি। যে সমস্ত শিশু সপ্তাহে দু'দিন স্যামন মাছ খায়, তাদের মগজ খুবই তীক্ষ্ণ হয়। এছাড়া টুনা এবং ম্যাকারেল নামের সামুদ্রিক মাছগুলিতেও যথেষ্ট পরিমাণে ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে।

ডিম : ডিমে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন পাওয়া যায়। ডিমের কুসুমে কোলাইন নামের উপাদান থাকে। এই উপাদানটি মগজের বিকাশের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। শিশুদের ব্রেকফাস্ট বা দুপুরের খাবারে ডিম খেতে দেওয়া উচিত।

চিনাবাদাম : চিনাবাদাম থেকে প্রস্তুত করা মাখনে ভিটামিন-ই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এটিতে থিয়ামাইন নামের আরেক উপাদান থাকে, যা মগজের শক্তি বাড়ায় এবং গ্লুকোজকে শক্তিতে রূপান্তর করতে স্নায়ুতন্ত্রকে সাহায্য করে। এছাড়া ছোটো ছোটো টুকরো করা চিনাবাদাম স্যালাড আইসক্রিম বা ফলমূলের সঙ্গে শিশুদের খেতে দিতে পারেন।

হোল গ্রেইন : সারাদিন ঠিকমতো কাজ করার জন্য মগজের নির্দিষ্ট পরিমাণের গ্লুকোজের প্রয়োজন হয়। এই গ্লুকোজ হোল গ্রেইনে পাওয়া যায়। এর আঁশ নিয়মিত গ্লুকোজ সরবরাহ করে। এছাড়া এর ভিটামিন-বি উপাদানটি শিশুদের স্নায়ুতন্ত্রকে শক্তিশালী করে।

ওটস : সাধারণত জই বা ওটসকে বলা হয় গেইন ফর দ্য ব্রেইন। ব্রেকফাস্টের সময় শিশুদের জই থেকে তৈরি খাবার খেতে দিলে মগজের শক্তি বাড়ে। আঁশযুক্ত জই খাওয়ালে শিশুরা গোটাদিন এনার্জি পায়। ওটসে ভিটামিন বি. ই, পটাসিয়াম এবং জিঙ্ক ইত্যাদি উপাদান থাকে। এই উপাদানগুলি শিশুর মগজ ও শরীরে শক্তি প্রদান করে।

বেরিজ : স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি, চেরি ইত্যাদিতে শক্তিশালী অ্যান্টি- অক্সিডেন্ট থাকে। এর রঙ যত গাঢ় হয়, পুষ্টিগুণ ততই বেশি হয়। এ ধরনের ফলে ভিটামিন সি থাকে। এই ভিটামিন ক্যান্সার রোগ প্রতিরোধ করে। শিশুদের স্মৃতিশক্তি বাড়াতে হলে নিয়মিত এ-ধরনের ফল খাওয়া উচিত। ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডও এ ধরনের ফলে পাওয়া যায়।

বিন : বিন হলো অতি উত্তম ব্রেইন ফুড। বিন চিন্তা করতে পারার শক্তি সরবরাহ করে। বিনে ভিটামিন, খনিজ দ্রব্য, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ইত্যাদি পাওয়া যায়।

সবুজ শাকসবজি : সবুজ শাকসবজিতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। অ্যান্টি অক্সিডেন্ট মগজের কোষগুলিকে শক্তিশালী করে তোলা-সহ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এছাড়া ভিটামিন ও খনিজ দ্রব্য শরীরের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে যে কোনও ধরনের আঁশযুক্ত সবজি শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কার করে।

দুধ ও দই : মগজের পেশি, এনজাইম, নিউরোট্রান্সমিটারের বিকাশের জন্য প্রোটিন ও ভিটামিন বি খুবই প্রয়োজন। দুধ ও দইয়ে প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট থাকে। তাই শিশুদের দুধ ও দই খাওয়ানো উচিত।

জিংক ও খনিজ দ্রব্য থাকা মাংস : জিংক তথা খনিজ দ্রব্য থাকা মাংস শিশুদের খেতে দিন। শিশুর বিকাশের জন্য খনিজ দ্রব্য খুবই প্রয়োজন। জিঙ্ক থাকা মাংস থেকে স্মৃতিশক্তি বাড়ে। যে শিশুরা মাংস খেতে চায় না, তাদের সোয়া ও ব্ল্যাকবিন খাওয়াতে পারেন। ▮

দাঙ্গাবাজ তাহির হুসেন দিল্লিওয়ালা নাকি বাংলাদেশি?

তাহির হুসেনের বাড়িতেই কি অঙ্কিত শর্মা খুনের ছক তৈরি হয়েছিল?

দেবযানী ভট্টাচার্য

জাতীয় রাজনীতি যা নিয়ে উত্তাল, দিল্লির সেই দাঙ্গা আদতে অনেকগুলি ঘটনার একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ যেগুলির সময়ানুক্রমটি তুলে না ধরলে বিষয়টি স্পষ্ট হয় না।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নিযুক্ত তিনজন ইন্টারলকিউটার বা মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে শাহিনবাগের অবস্থানকারীদের সঙ্গে আলোচনাটি ব্যর্থ হওয়ার পরেই শাহিনবাগ মঞ্চ মারমুখী হয়ে ওঠে। তাঁরা বুঝতে পারে যে তাঁদের প্রতিবাদে ভারত সরকার কর্ণপাত করছে না এবং রামলীলা ময়দানে সরে গেলে তাঁদের প্রতিবাদ একেবারেই গুরুত্ব হারাবে। কারণ রামলীলা ময়দানে ধরনা দিলে তার কোনো নেতিবাচক প্রভাব সাধারণ দিল্লিবাসীর দৈনন্দিন জীবনে তাঁরা ফেলতে পারবেন না। এই মধ্যস্থতা ব্যর্থ হওয়ার পরে ভারত সরকারের ওপর চাপ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে একই ধরনের অবরোধ তাঁরা শুরু করে দিল্লির জাফরাবাদ মেট্রো স্টেশনের সামনেও। জাফরাবাদ মেট্রো স্টেশন শাহিনবাগ মডেলে অবরুদ্ধ হওয়ার পর ২৩ ফেব্রুয়ারি, রবিবার, দিল্লির মৌজপুরে সিএএ-র সমর্থনে মিছিল করতে

তাহির হুসেনের বাড়ির ছাদ থেকে উদ্ধার হওয়া পেট্রল বোমা ও ইটের টুকরো।

তাহির হুসেন

যান বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র। সেই মিছিলকে লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়ে প্রতিবাদীরা। মিছিলের মঞ্চ থেকে কপিল মিশ্র বলেন, জাফরাবাদকে শাহিনবাগ হতে দেওয়া হবে না। পুলিশের সামনে হাত জোড় করে তিনি বলেন যে, পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে পুলিশ যদি রাস্তা অবরোধ তুলতে না পারে তবে ২৫ তারিখ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভারতবর্ষ ছাড়ার পর কপিল মিশ্ররাই পথে নামবেন রাস্তা খালি করতে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে রবিবার মৌজপুরে কপিল মিশ্রের মিছিলে পাথর ছোঁড়ার পাশাপাশি দিল্লির মালব্যনগরেও কিছু মহিলা আজাদি স্লোগান দেন শিব মন্দিরের সামনে। পরিস্থিতি দেখে দিল্লির বহু বিশিষ্ট মানুষই চাইছিলেন যে পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা নিক। এই অবস্থায় নিজের মিছিলে পাথরবাজদের হামলার পর বাকসংযমে যতটুকু ত্রুটি কপিল মিশ্রের হয়েছিল, ততটুকু না হলেই বোধ করি তাঁকে মানুষ কম, যন্ত্র বেশি বলে মনে হতো।

কপিল মিশ্রের এই মন্তব্যকে লুফে নেয় শাহিনবাগ মঞ্চের প্রতিবাদীরা। তারা সম্ভবত এটাই চেয়েছিল যে প্রতিবাদী মহিলা ও শিশুদের ওপর পুলিশি অ্যাকশন হোক এবং তাতে যতখানি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে, তাকে মূলধন করে বিভেদের নারকীয় রাজনীতি তারা শুরু করে দেবে বামপন্থী লবির সহায়তায়। দেশ জুড়ে তথা গোটা পৃথিবী জুড়ে। একবার দেশভাগ করে যে দৃষ্টান্ত তাঁরা রেখেছেন, তার যে পুনরাবৃত্তি হতো না, তা কি নিশ্চিতভাবে বলা যায়? দিল্লি নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন

নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে বলেছিলেন যে ‘শাহিনবাগ কোই সংযোগ নহি, এক প্রয়োগ হ্যায়’ তখন ভারতের সংবাদ মাধ্যম তাঁর সেই মন্তব্যকে নির্বাচন-পূর্ব ধর্মীয় মেরুকরণের প্রয়াস বলে লঘু করে দেখালেও দেশের বিদগ্ধ জনের একাংশ বিলক্ষণ বুঝেছিলেন যে কেবলমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এমন মন্তব্য করার মতো রাজনীতিবিদ নরেন্দ্র মোদী নন।

শাহিনবাগ আন্দোলনের শুরুতেই সেখানে অবস্থানরত বেশ কিছু মহিলার কথা শুনে ও মরিয়াভাব দেখে মনে হয়েছিল যে সকল মহিলাই যে সেখানে স্বেচ্ছায় ধরনা দিয়েছেন, এমন হয়তো নয়। ইন্ডিয়া টিভিতে দেশের আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদের সঙ্গে আলোচনা সভায় দু’জন মুসলমান মহিলা সাহসের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে শাহিনবাগের ক্ষেত্রে যে অপরিসীম ও প্রশংসনীয় ধৈর্য ভারত সরকার দেখিয়েছে, তা আদতে মুসলমান মহিলাদেরই প্রাণ রক্ষা করেছে। ওই দুই মহিলার ওই স্বীকারোক্তি বাস্তব সত্য। ভারত সরকারের অপরিসীম ধৈর্য একদিকে যেমন শাহিনবাগে ধরনারত মুসলমান মহিলাদের প্রাণরক্ষা করেছিল, অন্যদিকে তেমনই শাহিনবাগ-চক্রীদের অধৈর্য করে তুলেছিল। সরকার বা বিজেপির দিক থেকে এমন কোনো আচরণের প্রতীক্ষা তাদের মধ্যে প্রথমদিন থেকেই ছিল, যে-আচরণকে তারা প্ররোচনা বা উস্কানি বলে দাবি করতে পারে, যাতে সেই অজুহাতে কোনো নেতিবাচক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের সূচনা করা যায়। দিল্লির নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর কপিল মিশ্রের মৌজপুরের মন্তব্যটি তাদের সেই অজুহাত সরবরাহ করেছিল।

সোমবার সকাল থেকেই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে উত্তর-পূর্ব দিল্লি। ভারতবর্ষে মার্কিন প্রেসিডেন্টের আগমনের দিনেই তাণ্ডব নারকীয় রূপ ধারণ করে রাজধানীর বুকে। হিংসার বলি হন গোকুলপুরীর এসিপি অফিসের হেড কনস্টেবল রতনলাল। দিল্লির চান্দবাগে কর্তব্যরত অবস্থায় পাথর এসে লাগে তাঁর মাথায়। রতনলালের মৃত্যুর পর পরিস্থিতির অবনতি দ্রুততর হয়। একপক্ষের ক্রমাগত হুংকার, শুক্রবার থেকে মসজিদের লাউডস্পিকারের জোর আওয়াজ, পাথরবাজি, পেট্রল বোমাবাজি ও জায়গায় জায়গায় অগ্নিসংযোগের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে দিল্লির শান্তিকামী জনতার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট যখন আমেদাবাদে বক্তৃতা দিচ্ছেন, ভারতবর্ষের রাজধানী তখন আগ্নেয়গিরি। খবর ছড়িয়ে পড়ে যে সোমবার রাত্রেও ভয়াবহ জেহাদি পরিকল্পনা কার্যকর করার চেষ্টা করতে পারেন আপ বিধায়ক আমানাতুল্লাহ্ খান। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটতে দেওয়া হয়নি।

মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল নানা ভিডিয়ো যেখানে দেখা গিয়েছিল মহম্মদ শাহরুখ হাতের পিস্তল নাচাতে নাচাতে পুলিশকে তাগ করে গুলি ছুঁড়ছে। দেখা গিয়েছে উন্মত্ত পাথরবাজ মহিলাদের ছবি যাঁদের মুখে হিংস্রতার নগ্ন প্রকাশ। এমন অজস্র সব ছবি ও ভিডিয়ো পোস্ট করে নেটিজেনরা দাবি তুলেছিলেন দিল্লির দাঙ্গাকারীদের ওপর কড়া পুলিশি তৎপরতার, অথচ পশ্চিমবঙ্গের একপেশে সংবাদমাধ্যম পাথরবাজ, বন্দুকবাজদের কথা এবং সোমবার তারা কী ভয়ানক তাণ্ডব চালিয়েছে সেই তথ্যকে কার্যত প্রায় এড়িয়ে গিয়ে দিল্লির হিংসাকে হিন্দুত্ববাদীদের তাণ্ডব বলে প্রচার করতে শুরু করল। মহম্মদ শাহরুখকে ‘চন্দরলাল শুক্লা’ বলে প্রচার করতেও তারা ছাড়ল না।

এই দিনই, অর্থাৎ মঙ্গলবার দুপুরে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ্ দিল্লির পরিস্থিতি নিয়ে মিটিং করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল- সহ আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের

জেএনইউ-র প্রাক্তন ছাত্র উমর খালিদ। দিল্লি দাঙ্গার অন্যতম মাস্টারমাইন্ড। ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়োতে দেখা গেছে সিএএ-বিরোধী মুসলমানদের উদ্দেশে তিনি বলছেন, ‘শাহিনবাগ আমাদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছে। ট্রাম্প যখন আসবে তখন আমরা সবাই রাস্তায় নামব। সারা দুনিয়াকে বুঝিয়ে দেব ভারত মুসলমানদের সঙ্গে বৈষম্য করছে।’

সঙ্গে। যে মিটিঙের পর দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বলেন প্রয়োজনে দিল্লির রাস্তায় নামবে সেনা। রবিবার ও সোমবার দিল্লির পরিবেশ যখন ধাপে ধাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তখন কীভাবে যেন নিপাত্তা হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে আবার দেখা যায় মঙ্গলবার সকালে রাজঘাটে, মণীশ শিশোদিয়াকে সঙ্গে নিয়ে মৌনব্রত পালন করতে। তারপর দুপুরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে মিটিঙের পর তাঁর চকিত বোধোদয় এবং সংবাদমাধ্যমের সামনে বিবৃতি যে হিংসা কারুর পক্ষেই মঙ্গলজনক নয়। তাঁর এই বোধোদয় পূর্বেই হলে, হিংসার তাণ্ডবলীলা হয়তো ঘটত না।

২৬ ফেব্রুয়ারি, বুধবার আবিষ্কৃত হয় আর একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর অফিসার অঙ্কিত শর্মার দেহ উদ্ধার হয় চান্দ বাগে একটি নালার ভিতর থেকে। নালার মধ্য থেকে তাঁর উত্থিত, মুষ্টিবদ্ধ হাত জানান দিচ্ছিল যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করেছিলেন অফিসার অঙ্কিত শর্মা। ফরেনসিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে অঙ্কিতের দেহে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল ৪০০ বার এবং প্রতি আঘাতের পর ক্ষতে ঢালা হয়েছিল অ্যাসিড। তাঁর চোখ খুবলে বের করে নিয়ে এসে চোখের কোটরেও ঢালা হয়েছিল অ্যাসিড। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেশজুড়ে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের অন্তরাত্মাকে কাঁপিয়ে দেয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা মতো পুলিশ জানতে পারে যে দিল্লি কর্পোরেশনে আম

খুন করে ফেলে দেওয়া অঙ্কিত শর্মার দেহ নর্দমা থেকে তোলা হচ্ছে। (ইনসেটে অঙ্কিত)

আদমি পার্টির পার্ষদ তাহির হুসেনের বাড়িতে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অঙ্কিত শর্মাকে। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, তাঁকে যখন ঘিরে ধরে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় তাহির হুসেনের বাড়িতে, তখন তিনি ডিউটি থেকে বাড়ি ফিরে স্থানীয় পরিস্থিতির পরিদর্শনে বেরিয়েছিলেন। অঙ্কিত শর্মার এই মর্মান্তিক পরিণতির খবরের সঙ্গে সঙ্গে ২৬ ফেব্রুয়ারির খবরে এও প্রকাশিত হয় যে দিল্লির ঘটনার পিছনে হাত হয়েছে আইএসআই স্লিপার সেলের। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে অঙ্কিত শর্মার মৃত্যুকে একই দাঙ্গায় আর পাঁচজনের মৃত্যুর সঙ্গে এক করে দেখানোর জন্য মিডিয়ার যে প্রয়াস দেখা গিয়েছে তা সম্পূর্ণতই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। লক্ষণীয় বিষয় হলো, অন্য কাউকেই ৪০০ বার কোপানো হয়নি। তবে কেবল অঙ্কিত শর্মাকে এমন নৃশংসভাবে মারা হলো কেন? ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর অফিসার অঙ্কিত শর্মা কি তবে এমন কিছু জেনে ফেলেছিলেন, দাঙ্গাবাজদের জন্য যা মঙ্গলজনক ছিল না? দিল্লির ঘটনার সঙ্গে আইএসআই-এর সংযোগ থাকার সংবাদ হয়তো সেই দিকেই ইঙ্গিত করে। অফিসার অঙ্কিত শর্মাকে যারা মেরেছে, তাঁকে মারতে তারা হয়তো চেয়েছিল আরও আগেই। কিন্তু সুযোগ হয়নি। দাঙ্গা হয়তো তাদের সামনে এনে দিয়েছিল সেই সুযোগ, যাতে লোকে ভাবতে পারে যে অঙ্কিত মারা গিয়েছেন দাঙ্গায় এবং সেই সুযোগে অপরাধীরা নিজেদের জিঘাংসা চরিতার্থ করতে পারে অফিসার শর্মার ওপর।

অঙ্কিত শর্মাকে হত্যার পদ্ধতির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সন্দেশখালিতে প্রদীপ মণ্ডলদের মৃত্যুর পদ্ধতির সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও এবং উক্ত হত্যালীলায় রাডিকাল ইসলামিস্টদের হাত স্পষ্টভাবে অনুভূত হওয়া সত্ত্বেও মিডিয়ার হিন্দুত্ববিরোধী ও সরকার বিরোধী একপেশে রিপোর্টিংকে সাম্প্রদায়িক অশান্তির অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন বহু বিদগ্ধ মানুষ। উস্কানি দেওয়ার জন্য দায়ী যদি কাউকে করতেই হয়, তবে রাজদীপ সারদেশাই, বরখা দত্ত, শেখর গুপ্তা, সাবা নাকভিরাও বাদ যাবেন কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দেন নেটিজেনরা।

আম আদমি পার্টির পার্ষদ তাহির হুসেনের বিরুদ্ধে ওঠে অঙ্কিত শর্মাকে হত্যার অভিযোগ ও দাঙ্গার অন্যতম মূল চক্রী হওয়ার অভিযোগ। বহু প্রত্যক্ষদর্শী বয়ান, কপিল মিশ্রের এবং অন্যান্য আরও বহু মানুষের পোস্ট করা নানা ভিডিয়ো দেখিয়ে তীব্র অভিযোগ তোলা হয় যে তাহির হুসেনের বাড়ি থেকেই ছোঁড়া হয়েছে পেট্রলবোমা, আগুন লাগানো হয়েছে নানা জায়গায়, ছোঁড়া হয়েছে পাথর। ক্ষোভে ফুঁসতে থাকে দেশ। এমন সময় ২৭ তারিখ দুপুরবেলা খবরে প্রকাশিত হয় যে তাহির হুসেনের বাড়ির ছাদে বস্তা বস্তা পাথর, অ্যাসিড, পেট্রলবোমা, ছোঁড়ার গুলতি সব পাওয়া গিয়েছে।

দাঙ্গার অন্যতম মূল কারিগর হিসেবে তাহির হুসেনের নাম ২৬ ফেব্রুয়ারি ছড়িয়ে পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন সংবাদও ছড়িয়ে পড়ে যে তাহির হুসেনের সঙ্গে বাংলাদেশি সন্ত্রাসবাদীদের সংযোগ রয়েছে, শোনা যায় তাহির হুসেন নিজেও বাংলাদেশি এবং অরবিন্দ কেজরিওয়াল তা জানেন। শিরোমণি আকালি দলের নেতা মজিন্দর সিরসা বলেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও মণীশ শিশোদিয়ার ফোনের কল ডিটেল প্রকাশ করলেই দেখা যাবে যে হিংসার দিনগুলিতে তাহির হুসেনের সঙ্গে অনবরত কথা হয়েছে তাঁদের। কী কথা হয়েছে, তা যেন জনসাধারণকে জানায় দিল্লি পুলিশ, সেই অনুরোধ করেছেন সিরসা। বাংলাদেশি সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে তাহির হুসেনের যোগাযোগের অভিযোগ করেন বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামীও। স্বামী টুইট করেন যে অঙ্কিত শর্মা হয়তো তাহির হুসেনের গতিবিধির ওপর নজর রাখছিলেন এবং তার বাংলাদেশি যোগাযোগের সন্ধান পেয়েছিলেন। সেইজন্যই কি মরতে হলো তাঁকে? যদি তা হয়, তবে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর এবং সরকারের উচিত তা খতিয়ে দেখা। তবে তাহির হুসেনের বাংলাদেশি সংযোগ এবং দিল্লি দাঙ্গায় আইএসআই স্লিপার সেলের মদত— এই দুইটি বিষয় এক সূত্রে বাঁধা হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ভারত বিরোধী কার্যকলাপের জন্য আইএসআই যে বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করে না, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। উপরন্তু বাংলাদেশে বর্তমানে রোহিঙ্গাদের উপস্থিতির ফলে আইএসআই মদতপুষ্ট ভারতবিরোধী কার্যকলাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে, এটাই স্বাভাবিক। রোহিঙ্গাদের জঙ্গি কার্যকলাপের নথি ভারত সরকারের কাছে আছে। তাছাড়া এনডিএ আমলে ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্তের সুরক্ষা ব্যবস্থা অতিরিক্ত আঁটোসাঁটো হওয়ার ফলে ওই সীমান্ত দিয়ে সন্ত্রাসবাদী অনুপ্রবেশ আগের চেয়ে অপেক্ষাকৃত দুরূহ হয়ে পড়ায় প্রায় উন্মুক্ত পূর্ব সীমান্তকে সন্ত্রাসবাদীরা যে ভারতে প্রবেশের জন্য ব্যবহার করতে চাইবে, তা অপ্রত্যাশিত নয়। উপরন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রবেশকারী-প্রীতি বর্তমানে তাঁর ঘোষিত নীতি এবং তার জন্যই পশ্চিমবঙ্গ অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের স্বর্গরাজ্য। তাঁর নিরবচ্ছিন্ন অনুপ্রেরণায় অন্যান্য সাধারণ অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে আইএসআই মদতপুষ্ট বাংলাদেশি জঙ্গিও যে এ রাজ্য হয়ে দিল্লি বা উত্তরপ্রদেশে পৌঁছে যাচ্ছে না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। ■

দাঙ্গার সময় কেজরিকে ছ'বার ফোন করেছিলেন তাহির : এন. কে. সুদ

এন কে সুদ

দিল্লির দাঙ্গা কি পূর্ব পরিকল্পিত? দিল্লি পুলিশের হাতে এখনও পর্যন্ত যেসব তথ্য এসেছে তার ভিত্তিতে বলা যায় ওই দাঙ্গা হঠাৎ উত্তেজনার বশে হয়নি। অন্তত তিনচার মাস ধরে এর প্রস্তুতি চলছিল। সম্প্রতি ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র-এর প্রাক্তন আধিকারিক এন.কে. সুদ এ ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন। দিল্লি ভয়েস নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন এই দাঙ্গা বাম, অতি বাম এবং পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের ব্রেনচাইল্ড। স্বস্তিকায় সাক্ষাৎকারটির সম্পাদিত অংশবিশেষ প্রকাশিত হলো। —স.স্ব

□ দিল্লিতে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক ঘটনাবলী দিল্লির সাধারণ জনতা মনে হয় এখনো ভুলে যায়নি, হয়তো সেই কারণেই তাহির হোসেনের উপর আইনের পাঞ্জা ধীরে ধীরে এঁটে বসছে। এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

● **এন.কে. সুদ :** একটি বিষয় এতদিনে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, দিল্লির দাঙ্গা পূর্বপরিকল্পিত ছিল, তাতে আই এস আই এবং তাদের স্লিপার সেলগুলির সরাসরি হাত ছিল, স্লিপার সেলের সদস্যরা অবস্থানকারীদের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। দাঙ্গার সময়টা লক্ষ্য করুন। তা ঘটানো হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সফরের মাঝে, ২৪ ফেব্রুয়ারি। আরও কিছুদিন পিছনে গেলে দেখা যাবে এই ঘটনার পরিকল্পনা আরও কয়েকমাসের পুরোনো। যখন আম আদমি পার্টির এমএলএ আমানাতুল্লা খানের নেতৃত্বে পুরোনো দিল্লিতে একটি মন্দির ভেঙে ফেলা হয় এবং দিল্লির তৎকালীন পুলিশকর্তা কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে ঘটনাটিকে চেপে দেওয়ার দিকে বেশি আগ্রহ দেখান। এরপর শাহিনবাগের জমায়েত শুরু হয় এবং গণ্ডগোলের মাঝে এই পরিকল্পনা করতে আরও দু-মাস সময় পেয়ে যায় দাঙ্গাকারীরা। এদের পরিকল্পনার চরম মুহূর্ত এসে উপস্থিত হয় যখন আপ বিপুল ব্যবধানে জিতে দিল্লিতে আবার ক্ষমতা দখল করে। আমার মতে পাকিস্তানে এখন যাঁরা শাসন ক্ষমতায় আছেন তাঁরা এবং এখানকার বাম ও ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি চায়নি দিল্লিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার গঠিত হোক। তাঁরাও এই জয়ে প্রচ্ছন্ন মদত জুগিয়েছেন। ১১ মার্চ ভোটের ফলাফল আসার সঙ্গে সঙ্গে এই দাঙ্গার পরিকল্পনায় সিলমোহর পড়ে। কারণ যখন নিজেদেরই সরকার তখন আর কীসের ভয়! আমি আগেই বলেছি এই দাঙ্গায় পাকিস্তানের আইএসআই তাদের স্লিপার সেল এবং আম আদমি পার্টির নেতাদের সরাসরি সংযোগ ছিল। তবে একে দিল্লি আইবি-র পক্ষেও এক বিশাল ধাক্কা বলা যায়। কারণ তাহির হোসেনের বাড়িতে পাঁচশোর বেশি বহিরাগতের জমায়েত হলো, অস্ত্রশস্ত্র, অ্যাসিড, পাথর ও বোমা জমা করা হলো, দাঙ্গার পর তাহির হোসেন পালিয়ে গেলো— এই ঘটনাক্রমের কোনো আঁচ তারা পায়নি। এই খামতির দায় দিল্লি পুলিশকর্তা শ্রী পট্টনায়েকের উপর বর্তায়।

একজন দিল্লিবাসী হিসেবে আমি বলছি, তাহির হুসেনের উপর এফআইআর করে এখন আর কোনো লাভ নেই। দিল্লিবাসীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে, এখন তারা এমন কড়া অ্যাকশান দেখতে চায়, যাতে দিল্লির বুকে ভবিষ্যতে আর কোনো দাঙ্গা না হয়। আপের সর্বধর্ম সমন্বয়ের নাম যদি জেহাদি মুসলমানদের আস্ফালন হয়, তাহলে বরং সেনাবাহিনীর হাতে আইন শৃঙ্খলার ভার তুলে দেওয়া হোক। তাতে অন্তত পনেরো কোটি—একশো কোটির গল্প রোজ শুনতে হয় না।

আরেকটি বিষয়, এই তাহির হুসেন দাঙ্গার

কপিল মিশ্র

কদিন আমানাতুল্লা খানকে ছাপান্নবার, মনীশ সিসোদিরাকে দশবার এবং কেজরিওয়ালকে ছয়বার ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করেছে, যা আম আদমি পার্টির এই ঘটনাকে প্রত্যক্ষভাবে মদত দেওয়ার দিকে আঙ্গুল তুলে ধরে। আজ কেজরিওয়াল মৃতের পরিবারপরিজনের মুখ টাকা দিয়ে বন্ধ করতে চাইছেন, কিন্তু দিল্লিবাসী এতে ভুলবে না।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীঅমিত শাহকেও আমি বলতে চাই, দিল্লির জনগণ সেইদিন আপনাদের দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করবেন যেদিন আপনারা এইসব অপরাধী এবং তাদের পিতৃস্থানীয়, যারা পাকিস্তানে বসে আছে তাদের উপর কোনো কড়া কদম ওঠাতে পারবেন।

□ দিল্লির জনতা তো কোনো সদর্থক পদক্ষেপ দেখতে চাইছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত যদি দেখা যায় তো কিছু এফআইআর করা ছাড়া আর কিছুই হয়নি...

● **এন.কে. সুদ :** দেখুন পুলিশের কিছু কিছু কার্যপদ্ধতি আছে, তারা চট করে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে না, কিন্তু জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা অজিত দোভাল তো আক্রান্ত জায়াগাগুলিতে ঘুরে গিয়েছেন। উনি মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাঁদের সাহস জুগিয়েছেন, খুব ভালো কথা। পাশাপাশি উনি আক্রান্ত হিন্দুদের সঙ্গেও একই রকমভাবে কথা বলেছেন। বিজেপির তরফ থেকে যদি কোনো নেতার নাম করতে হয় তাহলে আমি শ্রীকপিল মিশ্রের নাম করব। আমার মতে শ্রী মদনলাল খুরানার পর বোধ হয় এই প্রথম দিল্লি বিজেপিতে একজন বলিষ্ঠ এবং রাষ্ট্রবাদী নেতার আগমন ঘটেছে।

অমিত শাহজীর উপর আমি এখনো ভরসা রাখি, কিন্তু মনে হয় একটু দেরি হয়ে গেছে।

□ দেখুন বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারকে তো মূলত হিন্দুদের স্বার্থরক্ষাকারী সরকার বলা যায়, তবে তাঁদের তরফ থেকেও তেমন কোনো সদর্থক পদক্ষেপ তো আসেনি ?

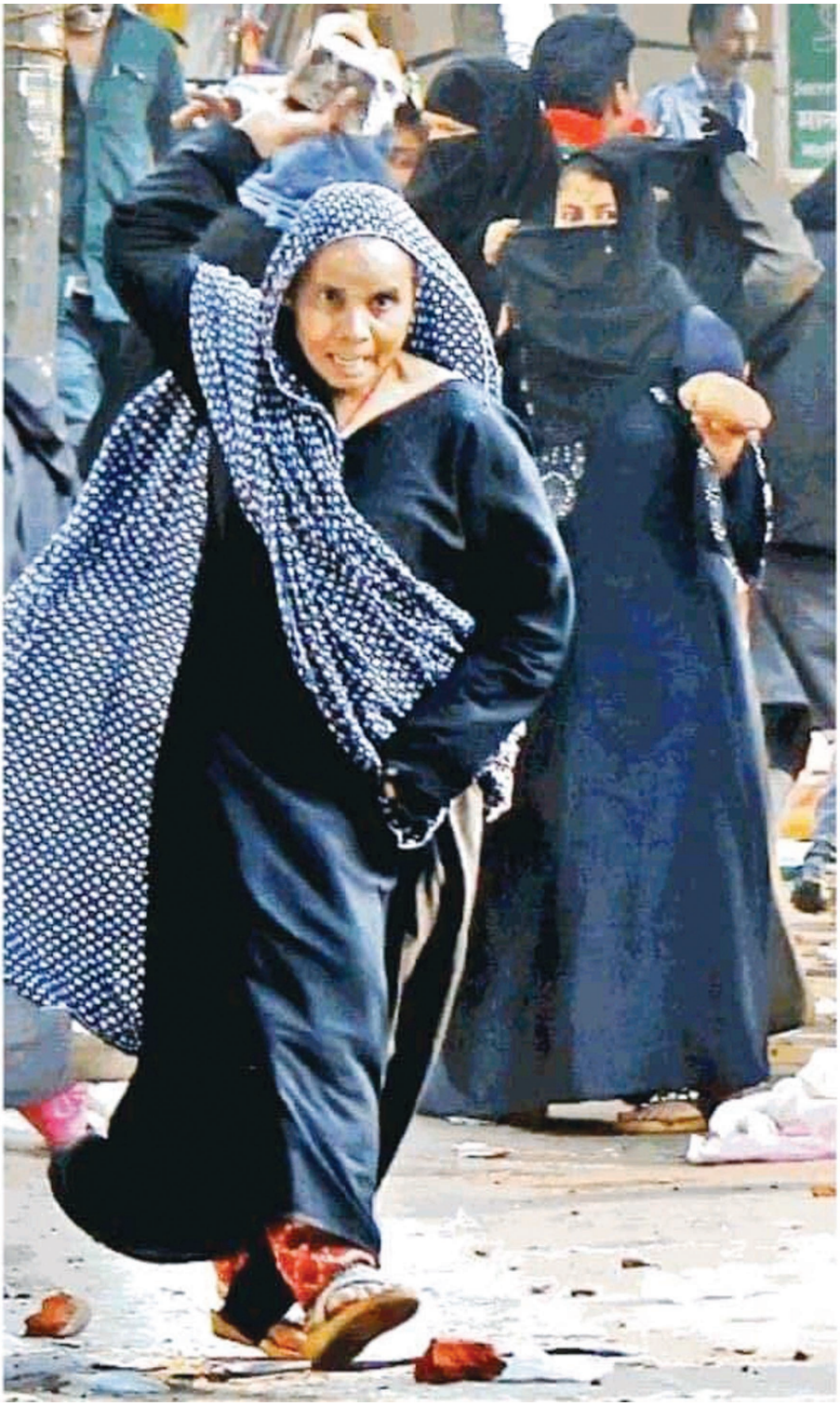

● **এন.কে. সুদ :** প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদী গত কয়েকবছর অনেক ভালো কাজ করেছেন, রাজনীতিতে তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। আর এই দাঙ্গা রুখতে ব্যর্থতার দায় আমি অন্তত তাঁর উপর চাপাতে চাই না। তবে দেশের এইসব অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা দমন করতে গিয়ে যদি সরকার আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে তার কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হবে সেই চিন্তা করে কিংবা ভারতের সংখ্যালঘুদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা..., তাহলে কোনোদিন এইসব সমস্যাকে নির্মূল করা সম্ভব নয়। সরকারকে সদর্থক পদক্ষেপ নিতে হবে, এইসব দাঙ্গাবাজদের যে বা যারা উসকানি দিচ্ছে তাদের কড়া হাতে দমন করতে হবে।

দাঙ্গার সময় সারণী

২৩ ফেব্রুয়ারি :

৪টের সময় দিল্লির মউজপুর চকে একটি মন্দিরের কাছে প্রতিবাদকারীরা সিএএ সমর্থনকারী মিছিলে পাথর ছোঁড়ে। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সিএএ-র প্রতিবাদী এবং সমর্থনকারীদের মধ্যে মউজপুর, কারওয়াল নগর, মউজপুর চক বাবরপুর এবং চাঁদবাগে সংঘর্ষ বাধে। অবস্থা সামাল দিতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে।

২৪ ফেব্রুয়ারি :

সকালে জাফরাবাদে সিএএ-বিরোধী প্রতিবাদ মঞ্চের পাশ দিয়ে সমর্থনকারীদের একটি মিছিল যাবার সময় গণ্ডগোল বাধে। বিকেল নাগাদ উত্তর-পূর্ব দিল্লির সর্বত্র অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। সন্ধ্যেবেলায় কদমপুরী এলাকায় একটি টায়ার বাজার জ্বালিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। অন্য একটি সংঘর্ষে নিহত হন হেড কনস্টেবল রতনলাল। চাঁদবাগে লাটিচার্জ করে পুলিশ।

২৫ ফেব্রুয়ারি :

সকাল থেকেই একদল মুখ ঢাকা দুষ্কৃতীর পাথর ছোঁড়ার ফলে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে মউজপুর এবং ব্রাহ্মপুরী এলাকা। পরিস্থিতি সামাল দিতে র‍্যাফ নামানো হয়। বিকেল তিনটে নাগাদ সিএএ-র বিরোধী এবং সমর্থনকারীদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায়। গামরি এলাকায় একটি গলির মধ্যে ঢুকে ৮৫ বছরের বৃদ্ধাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে দুষ্কৃতীরা। তাঁর বাড়িতেও অগ্নিসংযোগ করা হয়। কারওয়ালনগরে পুলিশকে তাক করে অ্যাসিড ছোঁড়ে প্রতিবেশীরা। এদিনের দাঙ্গায় আহত ৭০ জনের শরীরে বুলেটের আঘাত পাওয়া গেছে। ভজনপুরা, চাঁদবাস এবং কারওয়ালনগর অঞ্চলে দুষ্কৃতীদের লাঠি এবং লোহার রড হাতে প্রকাশ্যে ঘুরতে দেখা গেছে। রাজ দশটার সময় দাঙ্গাপ্রবণ এলাকায় দেখামাত্র গুলির নির্দেশ দেয় কেন্দ্র। এদিরে সব থেকে বড়ো ঘটনা পুলিশ আধিকারিক অঙ্কিত শর্মার মৃতদেহ উদ্ধার। তিনি আগের দিন থেকে নিখোঁজ ছিলেন। জাফরাবাদের কাছে একটি ড্রেন থেকে দেহটি মেলে। অটপ্সি রিপোর্ট থেকে জানা গেছে অঙ্কিতের শরীরে ৪০০টি ছুরিকাঘাতের চিহ্ন ছিল। প্রত্যেকবার ছুরি মামার পর অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ক্ষতস্থান। এমনকী চোখ উপড়ে নেওয়ার পরেও অ্যাসিড ঢালা হয়। পুলিশের অভিযোগ, জঙ্গিরা এরকম নৃশংসভাবে কাউকে হত্যা করে।

২৬ ফেব্রুয়ারি :

এদিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল দাঙ্গাপ্রবণ এলাকাগুলি ঘুরে দেখেন। কোনও কোনও পক্ষ থেকে দাঙ্গার জন্য বিজেপি নেতা কপিল মিশ্রকে দায়ী করা হলেও, কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচা এক ব্যক্তি স্পষ্টই জানিয়েছেন, খোলা তলোয়ার নিয়ে একদল লোক তাদের মহল্লা আক্রমণ করেছিল। তাদের মুখে ছিল সিএএ-বিরোধী স্লোগান এবং আল্লাহ্-হু-আকবর।

২৭ ফেব্রুয়ারি :

শিববিহারে বিরোধী ও সমর্থনকারীদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ বাঁধে। দুটো দোকানঘর, একটা গুদোমঘর এবং একটি মোটর সাইকেলে অগ্নিসংযোগ করে দুষ্কৃতীরা। ■

পাকিস্তানে বসে থাকা এদের কর্তাদের দুনিয়ার সামনে উলঙ্গ করতে হবে। আজকের দিনে আমি কেজরিওয়ালজীকেও সতর্ক করতে চাই। কারণ যতদিন আপ সরকার ক্ষমতায় থাকবে, এরকম দাঙ্গা-ফ্যাসাদ হতেই থাকবে, কারণ আপ সরকারের নেতারা এইসব ঘটনার সঙ্গে সরাসরি জড়িত। আর আপ সরকারের হাত-পা বাঁধা। আর যাঁরা এবার পরিকল্পনা করে দিল্লিতে বিজেপিকে হারিয়েছেন, তাঁদেরও এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার দায়ভার নিতে হবে। সঙ্ঘের সক্রিয়তা খুব চোখে পড়েছে। সঙ্ঘ সর্বপ্রথম হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি এবং হিন্দুদের স্বার্থরক্ষাই সঙ্ঘের প্রাথমিক কাজ। আমার মনে হয়েছে, দিল্লির ঘটনায় সঙ্ঘের গুরুত্ব আরও বেড়েছে। আর কেন্দ্রীয় সরকার যদি দিল্লিতে কোনো পদক্ষেপ না চায়, তবে তারা পাকিস্তানের উপর কিছু পদক্ষেপ নিক। তাতেও কাজ হবে।

□ খবরে প্রকাশ যে এফবিআই, আইএসআই-এর মতো বিদেশি এজেন্সিগুলির এই ঘটনায় সরাসরি মদত আছে, এটা কি আমাদের গোয়েন্দাদের ব্যার্থতা নয়?

● **এন.কে. সুদ :** দেখুন গোয়েন্দা এজেন্সিগুলির কাজ হচ্ছে তাঁরা বিভিন্ন সূত্র থেকে যেসব খবর পায় সেগুলি সম্পর্কে সরকারকে অবগত করা, এক্ষেত্রেও তারা তা করেছে, এর পরের পদক্ষেপ তো প্রশাসন বা পুলিশের নেওয়ার কথা। আমার কাছে তাহির হোসেন বা আমানাতুল্লা খানের ব্যাঙ্ক খাতাতে কত টাকা এসেছে তার খবর আছে, কিন্তু খবরের আদানপ্রদান ছাড়া আমরা আর কী করতে পারি? পুলিশের উপর বন্দুক ও পাথর হাতে আক্রমণ হলে যদি তাদের গুলি চালানোর অর্ডার নেওয়ার দরকার হয় তার থেকে বড়ো রসিকতা আর কী হতে পারে? খলিস্তানি সন্ত্রাসবাদীরা এতে যুক্ত ছিল, তারা শাহিনবাগে ধরনামঞ্চে খাবার পরিবেশন করেছে। অথচ ভজনপুরা অঞ্চলে যখন দাঙ্গা হলো, তখন দেখা গেল দাঙ্গাকারীরা শিখ ব্যবসায়ীদের দোকানপাটে সবার আগে আগুন লাগিয়েছে। সবাই যদি ভাবে তাদের একমাত্র কাজ সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা দেওয়া, এভাবে তো কাজ হয় না, কারণ মুসলমানরা আদৌ সংখ্যালঘু নয়। দিল্লি সরকারের এই নিষ্ক্রিয়তা মেনে নেওয়া যায় না।

□ আমাদের মনে প্রশ্ন উঠছে শাহিনবাগের ধরনামঞ্চের বিক্ষোভকারীদের উপর যদি কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হতো তা হলে হয়তো ঘটনাবলী এতটা হাতের বাইরে চলে যেত না।

● **এন.কে. সুদ :** সরকার হয়তো চায় না যে আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের ভাবমূর্তি খারাপ হোক, তাই হয়তো এই দুর্বলতা। তবে আর নয়, অনেক হয়েছে। এবার বলপ্রয়োগ করা দরকার, এদের এবার এখান থেকে উঠিয়ে দেওয়া উচিত। এরা মহিলাদের সামনে রেখেছে, আমাদেরও তো মহিলা পুলিশ রয়েছে। তাদের নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে কেন? পুরোনো দিনে মুসলমান শাসকরাও হিন্দুসেনাবাহিনীর সামনে গোরুর পাল রেখে যুদ্ধ করত, সেরকমভাবে এরা লড়ছে। এখন চাণক্যনীতি বা অন্য কোনো শক্ত ধরনের নীতির প্রয়োগ প্রয়োজন। না হলে এই দগ্‌দগে ঘা শরীরে থেকেই যাবে। এরা এখান থেকে উঠবে না, কারণ এরা টাকা-পয়সা পাচ্ছে, দিল্লি সরকারের মদত পাচ্ছে। এদের আন্দোলন সফল হলে দিল্লির খুব ক্ষতি হয়ে যাবে। ■

লাটাগুড়িতে অ্যাডভোকেটস এডুকেশন অ্যান্ড আপলিফটমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মশালা

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার লাটাগুড়ি শহরের তৃপ্তি ভবনে গত ২১-২৩ ফেব্রুয়ারি অ্যাডভোকেটস এডুকেশন অ্যান্ড আপলিফটমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে তিনদিনের আইনি কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রথমদিনে প্রদীপ প্রজ্বলন করে শিবিরের শুভারম্ভ করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচাপতি শ্রীমতী সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী ধনকর। এছাড়াও ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী গৌতম দেব ও জলপাইগুড়ির সাংসদ ড. জয়ন্ত রায়।

শিবিরে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের আইনজীবী সিরাজ কুরেশী, অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদের সংগঠন সম্পাদক জয়দীপ রায়, ভারতীয় জনতা পার্টির সংসদীয় কমিটির সদস্য কামারশু বালা সুব্রহ্মণ্যম্ এবং পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের সদস্য তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক অজয় নন্দী। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আদালতের ৩০০ জন আইনজীবী ও আইনের ছাত্র-ছাত্রী শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট -সহ মোট ৬টি সত্রে বিভিন্ন বিষয়ে প্রখ্যাত আইনজীবীরা আলোকপাত করেন। শিবিরের পরিকল্পনা ও রূপায়ণে ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী সমীর পাল ও বিশিষ্ট সমাজসেবী মনোজ দুবে। পরিচালনায় ছিলেন জাগৃতি মিশ্র, শুভঙ্কর চ্যাটার্জি, শ্রীমতী ধীশ্বরী নাগ ও নরেন বিশ্বাস।

উত্তরবঙ্গে জেলায় জেলায় বালক শিবির

গত ২৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জেলায় জেলায় বালক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। মালদা জেলার শিবির অনুষ্ঠিত হয় মালদা শহরের অরবিন্দ পার্ক সরস্বতী শিশুমন্দিরে। জেলার ১২ টি খণ্ড ও ২টি নগর সহ ১৪১ স্থান থেকে ৯ থেকে ১৪ বছরের ১০৫৮ জন শিবিরে অংশগ্রহণ করে। শিবির সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ছিলেন ১৫৪ জন শিক্ষক ও প্রবন্ধক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্বক্ষেত্রের সহক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল, প্রবীণ প্রচারক শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ নীলরতন সাহা। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ সহ প্রান্ত কার্যবাহ তরুণ কুমার পণ্ডিত, সহ প্রান্ত প্রচারক সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী, বিভাগ সঙ্ঘচালক সুভাষ কুমার দাস, জেলা সঙ্ঘচালক নির্মল কুমার নাথ প্রমুখ। দ্বিতীয় দিন উপস্থিত ছিলেন ক্ষেত্র বৌদ্ধিক প্রমুখ বলরাম দাসরায়, ক্ষেত্র কার্যকারিণীর সদস্য সত্যনারায়ণ মজুমদার, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক হৃষিকেশ সাহা, প্রান্ত কার্যবাহ প্রদীপ অধিকারী। সন্ধ্যায় মহাপুরুষদের জীবনী বিষয়ক চলচ্চিত্র ও ম্যাজিক শো'র ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ আকর্ষণ ছিল পুরাতন মালদা নগরের শ্রীগুরুজী শাখার স্বয়ংসেবকদের দ্বারা অয়োজিত গম্ভীরা গান। অন্য জেলাগুলিতে অংশগ্রহণকারী বালকের সংখ্যা ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর— ৩৭৫, উত্তর দিনাজপুর—২৭৬, উত্তর মুর্শিদাবাদ— ৩২৪, উত্তর মালদা— ৭০, শিলিগুড়ি— ২২০, কোচবিহার—২৫৯, পশ্চিম কোচবিহার— ২৪২।

বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির

পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত সমাজসেবী সংস্থা বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির উদ্যোগে গত ১৯ জানুয়ারি বীরভূমের বোলপুরের কাপটিকুরিয়া গ্রামে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সারদা মিশন ট্রাস্টের সহায়তায় এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। ১০৩ জনের চক্ষু পরীক্ষা করে ৯৫ জনকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয়। এছাড়া ৫৫ জনের অর্থোপেডিক চিকিৎসা ও ৩ জনের ইসিজি করা হয়। ২৫ জানুয়ারি হাওড়া জেলার চিতনান গ্রামে চিতনান চ্যারিটেবল অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটির সহায়তায় স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ১৫০ জনের চক্ষু পরীক্ষা করে ১৪৩ জনকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয়। ৭০ জনের অর্থোপেডিক ও সাধারণ চিকিৎসা, ৫৩ জনের বিএমডি, ৯ জনের চর্মরোগ, ৫ জনের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা এবং ৪ জনের ইসিজি করা হয়। এখানে বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির সভাপতি অজয় নন্দী উপস্থিত ছিলেন। গত ২ ফেব্রুয়ারি হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের বোরা গ্রামে প্রেমমন্দির জনকল্যাণ সমিতির সহায়তায় চক্ষু পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ১১০ জনের চক্ষু পরীক্ষা করে ১০২ জনকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয়। ৯০ জনের অর্থোপেডিক ও কার্ডিও চিকিৎসা, ৪৬ জনের চর্মরোগ ও জেনারেল, ৮৫ জনের বিএমডি, ৯ জনের ইসিজি এবং ১০ জনের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা হয়।

১৬ ফেব্রুয়ারি হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুরে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের সহযোগিতায় চক্ষু পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। মোট ৭৫ জনের চক্ষু পরীক্ষা করে ৬৯ জনকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয়। এই শিবিরে ৬৪ জনের অর্থোপেডিক, ৪ জনের বিএমডি ও কার্ডিওলজি পরীক্ষা এবং ২১ জনের মেডিসিন ও চর্মরোগের চিকিৎসা করা হয়।

২৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতা কৈখালির ইস্ট মল রোড স্থিত পুষ্পকনগর নাগরিক সমিতির সহযোগিতায় স্বাস্থ্য শিবির ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ১৩৬ জনের চক্ষু পরীক্ষা করে ১০৬ জনকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয়। এছাড়া ৯৪ জনের জেনারেল ও অর্থোপেডিক চিকিৎসা এবং ১২ জনের ইসিজি করা হয়।

রায়পুরে গোসেবার অখিল ভারতীয় বার্ষিক বৈঠক

ছত্তিশগড়ের রায়পুরে গত ১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হলো গোসেবার অখিল ভারতীয় বার্ষিক বৈঠক। বৈঠকের শুভারম্ভ করেন মহাশক্তিপীঠ কানপুরের জুনা আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বরী মা যোগ যোগেশ্বরী যতীজী।

উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় গোসেবা সংযোজক শঙ্করলাল, সহ সংযোজক অজিতভাই মহাপাত্র, অখিল ভারতীয় গোসেবা প্রশিক্ষণ প্রমুখ রাঘবনজী। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রদেশের সংযোজক ললিত আগরওয়াল, সহ সংযোজক গদাধর সিংসর্দার ও প্রশিক্ষণ প্রমুখ অতীশ ব্যানার্জি বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। সমাপ্তি অধিবেশনে পথনির্দেশ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী। তিনি বলেন, সারা দেশে গোসেবার কাজ অতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে। গঠনমূলক কাজের প্রতি আরও জোর দিতে হবে। প্রতিটি কৃষকের বাড়িতে গোপালনের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তার থেকে লাভের বিষয়টি খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে গোসেবার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতি মাসে বিভিন্ন জেলার একাধিক অঞ্চলে গো-গ্রাম উন্নয়ন প্রশিক্ষণ বর্গের আয়োজন করা হচ্ছে। এপর্যন্ত ৩৭টি বর্গে ৭৬৭ জন কৃষক এবং কয়েকটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী অংশগ্রহণ করেছে। এর ফলে গ্রামে গ্রামে গো-ভিত্তিক কৃষি, গো-ভিত্তিক শক্তি, গো-ভিত্তিক মানব চিকিৎসা, গো এবং কৃষিভিত্তিক কুটির শিল্পের দ্বারা মানুষ লাভবান হচ্ছেন।

প্রশিক্ষণ বর্গে যাঁরা অংশগ্রহণ করতে চান তাঁদের যোগাযোগ করতে হবে ঃ মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া বিভাগের জন্য গদাধর সিং সর্দার-- ৯৬৭৯১৫৫৪৩১, বর্ধমান ও হুগলী বিভাগের জন্য অতীশ ব্যানার্জি--৮২৫০৯০৩১০০, বীরভূম ও নদীয়া বিভাগের জন্য আশিস মণ্ডল-- ৯৭৩৪৮২৯০২০ এবং দুই ২৪ পরগনা বিভাগের জন্য সুব্রত সরদার-- ৮৯১৮১৬৩৩৫৪-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

উত্তরবঙ্গের জনক মনীষী পঞ্চানন বর্মার স্বদেশ চেতনা

বিনয় বর্মন

সম্প্রতি সমগ্র উত্তরবঙ্গে জুড়ে পালিত হলো মনীষী পঞ্চানন বর্মার ১৫৫তম জন্মদিবস। উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে পঞ্চানন বর্মার একটি আদর্শ বটবৃক্ষ। সেই ছত্রছায়ায় রাজবংশী সমাজ সম্মানজনক ভাবে বেঁচে থাকার দিশা পেয়েছে। শুধু উত্তরবঙ্গে নয়, সমস্ত স্তরের, সমস্ত ভারতবাসীর কাছে তাঁর কর্মময় জীবন, সমাজ সংস্কার, ব্যক্তিত্ব শিক্ষণীয়। উত্তরবঙ্গের প্রান্তীয় অঞ্চলে থেকে দেশের প্রতি, মাতৃভূমির প্রতি পঞ্চানন বর্মা যে ভাবনার জন্ম দিয়েছেন তা কেবল রাজবংশী সমাজের জন্য নয় উত্তরবঙ্গের সকল মানুষের কাছে গৌরবের ও আত্মাভিমানের বিষয়। এই মহান কর্মবীর মানুষটি ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে, বাংলা ১২৭২ বঙ্গাব্দের ১ ফাল্গুন, মাথাভাঙ্গার খলিসামারি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা খোষাল সরকার। মাতা চম্পলা দেবী। যে সময় সমগ্র উত্তরবঙ্গের গ্রাম জুড়ে শিক্ষার প্রতি মানুষের অনিহা ছিল, সেই সময়ে পিতা খোসাল সরকার তার একমাত্র পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার মাধ্যমে বড়ো করে তোলেন। পঞ্চানন বর্মা ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে এম.এ.,এল.এল.বি পাশ করেন। তিনি ছিলেন সেই সময়ের উত্তরবঙ্গের একজন বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তি। এত শিক্ষিত একজন ব্যক্তি সমাজে সবার কাছে সম্মানের পাত্র ছিলেন। পঞ্চানন বর্মা এম.এ., এল.এল.বি. পাশ করে এসে মাথাভাঙ্গার টাউন কমিটির পাঁচজন সদস্যের মধ্যে একজন আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। প্রবল দায়িত্ববোধ সম্পন্ন পঞ্চানন বর্মা নিষ্ঠার সঙ্গে পাঁচ বছর এই দায়িত্ব পালন করেন। আসলে তিনি আশা করেছিলেন নিজ রাজ্যে থেকে নিজ সমাজের জন্য, নিজ ভূমির জন্য কাজ করবেন। আর সে কারণে তিনি সে সময়কার কোচবিহার রাজ্যের দেওয়ান কালিকাদাস দত্তের কাছে নায়েব আহিলকার তথা মহকুমা শাসকের চাকুরির জন্য আবেদন করেন। কিন্তু যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও পঞ্চানন বর্মাকে সে চাকুরি দেওয়া হয় না। বরং তাঁকে দেওয়া হয় হোস্টেল সুপারিনটেন্ডের পদ। তাঁর ওপর দেওয়া হয় সেই হোস্টেলের বাচ্চাদের দেখভালের দায়িত্ব। সেই সময়ের এতবড়ো একজন শিক্ষিত ব্যক্তিকে কেন মহকুমা শাসকের চাকরি দেওয়া হলো না। কেনই বা একটি সাধারণ চাকরি দেওয়া হলো সে বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

নিজের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মহকুমা শাসকের চাকুরি না মেলায় পঞ্চানন বর্মা খুবই মর্মাহত হন। তবে হতাশ হয়ে ভেঙে পড়েননি। মনের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকা প্রতিবাদী সত্তা জাগ্রত হয়ে ওঠে। তিনি কোচরাজ্যের নানা দুর্নীতি, অনিয়ম, অর্থনৈতিক সংস্কারের সমালোচনা করেন। প্রতিবাদ করেন আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে। এমনকী মহারানি ইন্দিরা দেবীর অসংযত কার্যকলাপের বিরুদ্ধেও তিনি মতামত প্রকাশ করেন। নির্ভীক, প্রতিবাদী, স্পষ্টবাদী পঞ্চানন বর্মার উপর রাজপরিবার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে দেশদ্রোহিতার অজুহাতে তাঁকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করা হয়। পঞ্চানন বর্মা জানতেন রাজ-শাসকের বিরুদ্ধে তাঁর একার পক্ষে লড়াই করা সম্ভব নয়। তাই তিনি কোচরাজ্য ত্যাগ করে রংপুরে চলে যান এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য আইন ব্যবসা শুরু করেন।

রাজশক্তি পঞ্চানন বর্মার উপর যতই খড়্গহস্ত হোক না কেন, স্বদেশ, স্বভূমি, মাতৃভূমির প্রতি টান তিনি কখনও ভুলে যাননি। এদেশের ইতিহাস, এভূমির গৌরবগাথা, বীরত্বের কাহিনি, এই ভূমির সহজ সরল রাজবংশী সমাজ পঞ্চানন বর্মাকে বারবার আকর্ষিত করেছে। এদেশের ইতিহাসকে, এদেশের ঐতিহ্যকে কী করে সবার সামনে তুলে ধরা যায়, এই দেশের ইতিহাসকে,

এদেশের ঐতিহ্যকে কী করে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় এর জন্য তিনি ভাবতে শুরু করেন। কারণ তিনি জানতেন— 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী'। আর এই জন্মভূমির গৌরবগাথাকে সবার সামনে তুলে ধরাকেই তিনি পরম কর্তব্য বলে মনে করেন। আর সেকারণেই নির্মাণ করার চেষ্টা করেন 'কামতা অনুসন্ধান সমিতি।'

যে রাজপরিবার পঞ্চানন বর্মার উপর অত্যাচার করলো, যে রাজপরিবার পঞ্চানন বর্মাকে রাজ্য থেকে বিতারিত করলো, অথচ পঞ্চানন বর্মা সেই রাজপরিবারের, সেই জন্মভূমির গৌরবগাথাকেই সকলের মধ্যে প্রচার করতে লাগলেন। একে দেশভক্তি বা স্বদেশপ্রেম ছাড়া আর কী বলা যাবে! তাঁর কয়েকটি বক্তব্যের অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরলে বোঝা যাবে নিজের জন্মভূমির জন্য তিনি কতটা গৌরববোধ করতেন। ১৩১৭ সালের ১৮ ও ১৯ বৈশাখ রংপুর নাট্যমন্দিরে অনুষ্ঠিত ক্ষত্রিয় সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেন—

'ইতিহাস বহু তথ্য আমাদের সম্মুখে ধরিতেছে, অত্যাচারী দেবী সিংহের বিরুদ্ধে রংপুরী রাজবংশীরা অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তস্নাত হইয়াছিল, সেই রক্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল কারণ। চারিশত বৎসর পূর্বে চিলা রায়ের অধীনে পরিচালিত হইয়া রাজবংশী বীরগণ অতুল বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাদের বলবীর্যে কামতাবিহার রাজ্য উত্তরে ধবলগিরি, পূর্বে ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণে সাগর, পশ্চিমে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। গৌড় আক্রমণ বিধ্বস্ত করিয়া হোসেন শাহ কর্তৃক কামতা ধ্বংসের প্রতিশোধ লইয়াছিল। রাজা কান্তেশ্বরের উজ্জ্বলকীর্তি গোসানীমারির পবিত্র তীর্থ ধরিয়া রাখিয়াছে। গড় নামে বিখ্যাত জনপথ ও যুদ্ধপথগুলি কান্তেশ্বরের কথা মনে তুলিয়া দিয়া আজিও নিভা আগুন জ্বালাইয়া দিতেছে। ইহার পূর্বেও ইহারা মহাপ্রতাপী অতি সহজে বাঙ্গলার বিজেতা বক্তিয়ার খিলজির সমগ্র সৈন্য ধ্বংস করিয়া করতোয়ার স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছিল। ...অল্পমাত্রায় হইলেও ইতিহাস এই গৌরব দেখাইলো। শ্রম স্বীকার করিলে ইতিহাস আরও বহু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইবে সন্দেহ নাই।'

১৩১৪ সালে রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় 'গোবিন্দ মিশ্রের গীতা' নামক প্রবন্ধে পঞ্চানন বর্মার মাতৃভূমির প্রতি প্রেম ও স্বজাতিবোধ আরও প্রবল ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে তিনি আরও জানান—

'বাঙ্গলা তখন বহু বছরের পরাধীন। কামতা স্বাধীন। কামতার রাজাগণ প্রবল প্রতাপী ও বিজয়ী। নরনারায়ণ ও মল্লনারায়ণ দুই ভাই উত্তরে ভূটান ও সিকিম অধিকার করেছিলেন। নেপাল পরাজিত হইয়াছিল। পূর্বে অহমরাজা কর প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মণিপুরে আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার দক্ষিণে শ্রীহট্ট অধিকার করিয়া ত্রিপুরার রাজাকে কর প্রদান করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। পশ্চিমে গৌড়দেশ জয় করিয়া গঙ্গাতীর পর্যন্ত নিজ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। মহারাজ প্রাণনারায়ণও বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। বাঙ্গলার শাসনকর্তারা ও দিল্লির বাদশাহরা তাঁহার সঙ্গে বিরোধে সাহসী হইতেন না। তেজদীপ্ত, দেবতুল্য ভূপতিগণ দ্বারা পরিচালিত কামতাবাসীগণ স্বাধীনসুখে সর্বদা উল্লাসী ছিলেন। উপচিতানন্দস্ফুরদ্‌বীর্য কামতাবাসী পরাধীনতাকে পাপজ্ঞান করিতেন।'

স্বদেশ ভূমির ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা-ভালোবাসা সত্যি কৌতুকের জন্ম দেয়। আসলে মুহ্যমান জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যই সম্ভবত তিনি এসব লিখেছিলেন। কেনন তিনি জানতেন সমগ্র জাতিকে না জাগাতে পারলে দেশ এগোবে না, সমাজ এগোবে না। আর জাতিকে তথা সমাজকে জাগানোর একমত্র উপায় অতীতের গৌরবময় ইতিহাসের গৌরবগাথাকে স্মরণ করানো। আর দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে তাই করতে হবে। পঞ্চানন বর্মার অন্য একটি ভাষণ থেকে তার প্রমাণ মেলে। অসমের ধুবরী শহরে অনুষ্ঠিত ক্ষত্রিয় সমিতির একাদশ বার্ষিক সম্মেলনের প্রস্তাবের সমর্থনে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন—

'আমরা এখন গৌরবহীন দীনবেশী। আমাদের দেশেরও বর্তমান গৌরবের কিছু নাই।... দেশের সর্বত্র পরিদৃষ্ট বিপুল ভগ্নাবশেষ পূর্বকালীন উজ্জ্বল গৌরবের বিপুল কীর্তির কথা বলিয়া দেয়। প্রাচীন উদ্ভাস্বর মাহাত্ম্যের কথা ভাবাইয়া পূর্ব স্মৃতি জাগাইয়া দেয় এবং ব্যাকুল অন্তরে পূর্বাপর কালের অবস্থার তুলনা করাইয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়ায়।'

অর্থাৎ দেশ মাতৃকার প্রতি কতটা টান কতটা ভালোবাসা থাকলে একথা বলা সম্ভব হয়। পরাধীন মাতৃভূমির সেই সময়ের গৌরবহীন দীনবেশী অবস্থা পঞ্চানন বর্মাকে ব্যথিত করে তোলে। তাই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকেও তিনি মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেননি। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে পঞ্চানন ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে রংপুরে চলে আসেন। এর চার বছর পর কার্জন সাহেব বাঙ্গলা ভাগ করার কুট চক্রান্ত গ্রহণ করে। এতে স্থির হয় বেঙ্গল ডিভিশনের অন্যান্য জেলার সঙ্গে সঙ্গে কোচবিহার এবং রংপুর জেলা ভাগ হয়ে যাবে। কার্জনের পরিকল্পনা অনুসারে রংপুর পুর্ববঙ্গের সঙ্গে এবং কোচবিহার অসম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হবে। নিজ জন্মভূমি এবং কর্মভূমির ওই বিভাজনে পঞ্চানন বর্মা চুপ করে বসে থাকতে পারেননি। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সর্বতো ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং আন্দোলনের শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছেন।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বাঙ্গলা ভাগ রদ হয়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে আন্দোলনকারীরা জয় লাভ করে। এর তিন বছর পরেই বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজতে শুরু করে। জার্মানির আক্রমণে মিত্রশক্তি যখন পর্যুদস্ত, তখন ব্রিটিশ সরকার ভারত থেকে অর্থ ও সৈন্য নিয়ে যেতে লাগল ইংল্যান্ডকে রক্ষা করার জন্য। ইংরেজ সরকার ঘোষণা করে— ভারত যদি অর্থ ও সৈন্য দিয়ে যুদ্ধে সাহায্য করে তাহলে যুদ্ধশেষে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। ইংরেজ সরকারের এই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে ভারতের তৎকালীন কংগ্রেসের বড়ো বড়ো নেতা ইংরেজকে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করেন। কংগ্রেসের সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গান্ধীজী প্রমুখ ইংরেজের পাশে দাঁড়ান। এই সময় দেশের বড়ো বড়ো নেতাদের দেখে দেশাত্মবোধের টানে, দেশের স্বাধীনতার জন্য পঞ্চানন বর্মাও যুদ্ধে ইংরেজকে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পঞ্চানন বর্মা এই সময় দেশের কাজে রাজবংশী যুবকদের জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। কেননা তিনি জানতেন এই পথেই রাজবংশী যুবকদের জাগিয়ে তোলা যেতে পারে। রাজবংশীরা ক্ষত্রিয়। আর ক্ষত্রিয়াদের পরমধর্ম হলো যুদ্ধ করা, বীরত্ব প্রদর্শন করা। তাই ইংরেজদের সহযোগিতা করার জন্য তিনি এদেশীয় যুবকদের যুদ্ধের খাতায় নাম লেখানোর জন্য আহ্বান করেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে বহু যুবক এগিয়ে আসে যুদ্ধের খাতায় নাম লেখাতে। পঞ্চানন তাদের উদ্দেশে জানান— দেশ যেদিন স্বাধীন হবে সেদিন তোমাদেরই নিতে হবে দেশ রক্ষার দায়িত্ব। এই সময় নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল ৪৯ নং বেঙ্গলি রেজিমেন্ট। পঞ্চানন বর্মা রাজবংশী যুবকদের এই রেজিমেন্টে যোগদান করতে উৎসাহিত করেন। এই সময় প্রায় দেড় হাজার যুবক, ভারতমাতার বীরসন্তান পঞ্চানন বর্মার ডাকে এই যুদ্ধে যোগদান করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে অর্থাৎ ১৯১৭ সালে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার ছিলেন M.J. Morahar। তিনি একসময় রাজশাহী বিভাগের কমিশনার ছিলেন। সেই সময় পঞ্চানন বর্মা ও রাজবংশী সমাজের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছিল। পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে পঞ্চানন বর্মা মোলাহার সাহেবকে এদেশীয় যুবকদের সেনাবৃত্তিতে নিয়োগের জন্য অনুরোধ জানান। এর উত্তরে মোলাহার সাহেব ১৯১৭ সালের ৬ এপ্রিল এক চিঠিতে পঞ্চানন বর্মাকে জানান— 'A Sparate company composed of Rajbanshi (Khatriya) of the upper and middle classes might be formed if suitable candidate are available.' —(বর্মন, উপেন্দ্রনাথ, মনীষী পঞ্চানন বর্মার জীবনচরিত)। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আলাদা কোনো ক্ষত্রিয় রেজিমেন্ট তৈরি হয়নি।

১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধর সমাপ্ত হয়। যুদ্ধে মিত্রশক্তি জয় লাভ করে। কিন্তু ভারতবাসীর স্বাধীনতার স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। যে আশায় ভারতবাসী ইংরেজকে যুদ্ধে সহযোগিতা করেছিল, তা আর পূরণ হলো না। তারা স্বাধীনতার পরিবর্তে ভারতবাসীর উপর দমনপীড়ন ও অত্যাচার শুরু করে। যার প্রমাণ আমরা লক্ষ্য করি পরের বছরেই পঞ্জাবের ছোটোলাট জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে জালিয়ানওয়ালাবাগের জঘন্য হত্যাকাণ্ড (১৩ এপ্রিল, ১৯১৯)। এই হত্যাকাণ্ড সমস্ত ভারতবাসীকে বেদনা ভারাক্রান্ত করে তোলে। এর প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। গান্ধীজী 'কাইজার-ই-হিন্দ' উপাধি ত্যাগ করেন। পঞ্চানন ঠাকুরের উৎসাহে তাঁর সহকর্মী রাজবংশী নেতা জগদীন্দ্রদেব রায়কত অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এই নির্মম হত্যাকাণ্ড সারা ভারতবাসীর সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চানন বর্মাকেও প্রচণ্ড ভাবে আঘাত করে। তিনি ঠিক করেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে এবার বদলা নেওয়ার সময় এসেছে। কিন্তু তিনি জানেন ইংরেজের হাতে মারা সম্ভব নয়, তাই তিনি তাদের ভাতে মারার পরিকল্পনা করেন। শুরু হয় সমস্ত রাজবংশী সমাজের মধ্যে স্বাদেশিকতার প্রচার। কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এদেশীয়রা যদি ইংরেজদের তৈরি কাপড় না কেনে, নিজেদের কাপড় নিজেরাই করতে পারে, তাহলে একদিকে যেমন তারা স্বাবলম্বী হতে পারবে, তেমনি ইংরেজদের ব্যবসায়েও ভাটা পড়বে। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় সেই ভাবনা থেকে মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, রংপুর ও দিনাজপুরের বিভিন্ন সভায় স্বাদেশিকতার উপর জোর দিয়ে প্রচার করেন। তিনি 'ক্ষত্রিয় কমিটি' থেকে সকলের প্রতি নির্দেশ দিয়ে জানান— 'আমাদিগকে ঘরে ঘরে বিছানর চাদর, আটপৌরে কাপড়, সাধারণ গায়ে দেওয়র চাদর তৈরি করার মতো সুতাকাটার শিক্ষা লাভ করতে হবে। সকলের খদ্দর ব্যবহার করাই সঙ্গত' (ক্ষত্রিয় পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ. ২৩)। তাঁর এই প্রচারের পর সর্বত্র এদেশীয়দের ঘর ঘর চরকার ঘর্ঘর শব্দ শোনা যেতে লাগল। সকলের মুখে গীত হলো চরকার গান—

'চরকা আমার ভাতার পুত
চরকা আমার নাতি।
চরকার দৌলতে আমার
দুয়ারে বাঁধা হাতি।।'

রাজবংশীরা চরকার গান গেয়ে অন্যান্য কৃষিকাজের ফাঁকে সুতা ও পরনের কাপড় তৈরি করতে লাগল।

আসলে উত্তরবঙ্গের প্রান্তীয় অঞ্চলে থেকে দেশের প্রতি জন্মভূমির প্রতি পঞ্চানন বর্মা যে ভাবনার জন্ম দিয়েছেন তা কেবল রাজবংশী সমাজের জন্য নয়, উত্তরবঙ্গের বসবাসকারী সমস্ত মানুষের কাছে গৌরবের বিষয়, আত্মাভিমানের বিষয়। তাই পঞ্চানন বর্মাকে কোনো একটি গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা যায় না। তাঁর সমাজ সংস্কার, দেশাত্মবোধের দ্বারা জাতিকে উজ্জীবিত করা সকলের কাছে আদর্শ স্বরূপ। তিনি যদি ক্ষত্রিয় সমিতি তৈরি না করতেন তাহলে এদেশীয় অসংখ্য মানুষ ধর্মান্তরিত হতো। তই জাতি রক্ষার জন্যও তাঁর অবদান অফুরন্ত। আর সে কারণেই বিশিষ্ট গবেষক ড. আনন্দগোপাল ঘোষ একটি প্রবন্ধে যথার্থই লিখেছেন— 'পঞ্চানন বর্মার ক্ষত্রিয় সমিতির আন্দোলন কতটা জাগরণ সৃষ্টি করে প্রান্তবঙ্গের হিন্দু সমাজকে রক্ষা করেছিল, এটিই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। শুধু প্রান্তবঙ্গের ক্ষত্রিয় সমিতির আন্দোলন নয়, একই ভাবে শ্রীহরিচাঁদ, গুরুচাঁদ ঠাকুরের সমাজ আন্দোলন ও পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র সমাজে ধর্মান্তরকে প্রতিহত করতে পেরেছিল। নইলে পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র সমাজ ও উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের অস্তিত্ব কতটা আজ আমরা পেতাম, সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রীহরিচাঁদ, গুরুচাঁদ, পঞ্চানন বর্মা ও তাঁদের পূর্বসূরি হরিমোহন খাজাঞ্চীরা আন্দোলন শুরু না করলে রাঢ় ও কলকাতা সন্নিহিত অঞ্চল বাদে অখণ্ড বঙ্গের বৃহদংশই মুসলমান হয়ে যেতেন (ঘোষ, আনন্দগোপাল, মনীষী পঞ্চানন বর্মা ও তাঁর আন্দোলনের উত্তরাধিকার, সংবেদন প্রকাশন, ২০১৫)। ■

বাঙ্গালির জাগরণ শুরু রয়েছে, এবার জয় সুনিশ্চিত

ড. জিষ্ণু বসু

কবি জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন, 'মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে / এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপে/ দেখেছিল।' সত্যি সত্যিই বহুদিন পরে এমন সময় আসে। যখন চম্পক নগরীর কাছে প্রাণচঞ্চল বাঙ্গলার মুখ দেখা যায়। যে বাঙ্গলা ভারতবর্ষকে নবজাগরণের পথ দেখিয়েছিল।

যেদিন হতাশ সমাজের উদ্ধারের জন্য নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত ভগবান শ্রীচৈতন্য হয়ে উঠেছিলেন, সেদিন বাঙ্গলায় এমন দিন এসেছিল। কলকাতার সিমলাপল্লীর ছেলে নরেন্দ্রনাথ দত্ত যেদিন জগৎ কাঁপিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে এসেছিলেন সেদিনও সারা ভারতবর্ষ তাকিয়ে দেখেছিল বাঙ্গলার মুখ।

যেদিন বার্লিন রেডিয়ো থেকে বাঙ্গলার সুভাষ বলেছিলেন, 'আমি সুভাষ বলছি', সেদিনও বাঙ্গলার মানুষ আশায় বুক বেঁধেছিল। কিন্তু সুভাষ ঘরে ফেরেননি। ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নেকড়ের মুখের থেকে পশ্চিমবঙ্গকে ছিনিয়ে এনেছিলেন। তিনি একদেশে এক বিধান, এক প্রধান, এক নিশানের দাবি নিয়ে কাশ্মীরে গিয়েছিলেন। আজ অন্য সব প্রদেশের মতো কাশ্মীর ভারতে বিলীন হয়ে গেছে, কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ তাঁর প্রাণ আহুতি দিয়েছেন। বারবার দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে বাঙ্গলার মানুষ। সুখ যেন তার কপালে লেখেননি বিধাতা। ১৯৭২ সালের ২ জুলাই নতুন দেশ বাংলাদেশের জন্মের আনন্দে ব্রিগেড ভরিয়ে দিয়েছিল বাঙ্গলার মানুষ। আজ পর্যন্ত সেই জনজোয়ারের রেকর্ড ভাঙা যায়নি। সেদিন ভারত আর বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড়ছিল মঞ্চে। দুই দেশের প্রধান বন্ধুত্বের শপথ নিয়েছিলেন। বাঙ্গলা মনে করেছিল তার দুঃখের দিন শেষ হলো।

কিন্তু তা হলো না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভেবেছিল তাদের আত্মীয় বন্ধু যারা ওপার বাংলায় আছেন তারা এবার শান্তি পাবে। তাদের দুঃখের দিন শেষ হলো। কিন্তু তা হলো না। বঙ্গবন্ধু নিজেও বাংলাদেশের সংবিধানকে সম্পূর্ণ মৌলবাদ মুক্ত করতে পারলেন না। নতুন বাংলাদেশের নতুন সংবিধানের প্রথম লাইনেই লেখা হলো, 'বিসমিল্লাহ রহমান-ইর-রহিম'। পাকিস্তান সরকার যে শত্রু সম্পত্তি আইন প্রণয়ন করেছিল, তার বদলে এল অর্পিত সম্পত্তি আইন। হতভাগ্য হিন্দুরা তাদের সম্পত্তি ফিরে পেল না। এরপরেই ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ খুন হলেন বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান। হিন্দুদের উপর অত্যাচার আবার শুরু হলো। ঢাকার একেবারে হৃদয়স্থলে অবস্থিত রমনা কালীমন্দির কয়েকশো বছরের পুরাতন। খান সেনারা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল রমনা কালীমন্দির। রমনায় মায়ের মন্দির আজও তৈরি হলো না।

এরপর থেকে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে পরিণত হলো এক সম্পূর্ণ ইসলামি দেশে। সত্যি বা মিথ্যা কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে কেবলমাত্র হিন্দুদের উপরই অত্যাচার শুরু হলো। ফিরে এল ১৯৭১ সালের আগের পরিস্থিতি।

ওপার বাংলা থেকে ধর্ষিতা, লুণ্ঠিত, অত্যাচারিত হিন্দুর স্রোত এপারের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে ভরে গেল। এরমধ্যেই ১৯৭৯ সালে ঘটে গেল সুন্দরবনের মরিচঝাঁপির নারকীয় হত্যাকাণ্ড। বামফ্রন্টের পুলিস নির্দয়ভাবে গুলি করে হত্যা করল পূর্ববঙ্গ থেকে আসা শতশত নিরীহ নিরস্ত্র তপশিলি জাতিভুক্ত হিন্দুকে। যারা এবার ভারতে এলেন তাদের অতিরিক্ত অসুবিধা হলো, 'ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি'। এই অত্যাচারিত বাঙালি হিন্দুরা নাগরিকত্ব পেল না। বারাসত, নদীয়া, রায়গঞ্জ, ক্যানিং কিংবা কুচবিহার সর্বত্র উদ্বাস্তু মানুষকে সহ্য করতে হলো পুলিশের অত্যাচার। রাজনৈতিক দলগুলি এই মানুষগুলির অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাদের বিনে মাইনের ভৃত্যের মতো ব্যবহার করেছে।

বিগত অর্ধশতক ধরে এক ভয়ানক রাজনৈতিক ভাবনা সমাজকে আচ্ছন্ন করে রাখে। বাঙ্গলার যে ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, গর্বের ধন তার মূলে ছিল তার শক্তিশালী সমাজ ব্যবস্থা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্বদেশী সমাজ রচনায় তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই সমাজই এত ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও বাঙ্গলাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই সমাজ বীথির মিলনস্থলে দাঁড়িয়ে 'মা' বলে ডাকার আহ্বান দিয়েছিলেন। বামপন্থীরা এই 'মা'-কে ভুলিয়ে, দেশের সব ঐতিহ্য মুছে ফেলে, সমাজকে শেষ করে ফেলার কাজ শুরু করেছিলেন।

সমাজের স্থান নিল পার্টি। মানুষে মানুষে সম্পর্ক, গ্রামের মানুষের ভালোবাসা, পাড়া প্রতিবেশীর আন্তরিকতাকে সন্দেহের চোখে দেখা হতো। পার্টি মনে করত যে জীবনের কোনো কিছুই রাজনীতি ছাড়া হয় না। তাই পরিবারের সমস্যার সমাধানেও ঢুকে গেল পার্টি। বাবা-ছেলের সম্পর্ক, ভাই-ভাইয়ের সম্পর্ক, ভাই-বোনের স্বাভাবিক সম্পর্ক, জায়ে-জায়ের সম্পর্ক

হিন্দু সমাজ যেদিন শ্রীরামচন্দ্রের নামে পথে নামল সেদিন জেহাদি মৌলবাদ, রাজনৈতিক ধান্দাবাজি, মাওবাদ, উগ্র অসহিষ্ণু বামপন্থা সবাই পাততাড়ি গুটিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। যারা সংবাদ পরিবেশনের নামে মিথ্যার বেসাতি করেন তারা কয়েকদিন 'বাংলার ঐতিহ্য' হারিয়ে গেল, হারিয়ে গেল বলে চিৎকার করতে করতে হাঁপিয়ে উঠলেন। বাঙ্গলার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ তাঁদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন, বাংলাদেশে নরহত্যার সময় আপনারা কোথায় ছিলেন? কলকাতায় ২০০৭ সালে দাঙ্গার সময় আপনারা একটি লাইনও লেখেননি কেন? কলকাতার সংবাদমাধ্যমের সাহস, সততা, গৌরবকে আপনারা ক্ষুদ্র কায়েমি স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়েছেন।

সবকিছুকে ছিন্ন করে দিল পার্টি। সাতের দশকের থেকে চারদশকে হত্যা করা হলো পশ্চিমবঙ্গের 'স্বদেশী সমাজ'কে। তার জায়গা নিল পার্টি অফিস।

শিক্ষা ক্ষেত্রে কেবল নিজেদের লোক খোঁজার ঠ্যালায় মান নেমে গেল। প্রাথমিক শিক্ষাকে শিকেয় তুলে পার্টিতন্ত্রের দলদাস তৈরি করা হলো। মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন করা হলো ভারতীয় সংস্কৃতিকে। সংস্কৃত শিক্ষা বন্ধ হয়ে গেল। ১৯৯৪ সালে ভারতবর্ষে প্রথম মাদ্রাসা বোর্ড শুরু হলো পশ্চিমবঙ্গে। ভারতীয় সংবিধানে সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীর জন্য ভিন্ন পাঠ্য সিলেবাসের ব্যবস্থা নেই। খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলও সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সেখানে পাঠক্রম আলাদা নয়। মৌলবাদ এরজন্যেই প্রথম সরকারি স্বীকৃতি পেল।

কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই রাজনৈতিক ভাবনার পুরুষ ও মহিলাই অধ্যাপনার সুযোগ পেতেন। তাঁরাও তিরিশ বছর ধরে তাদের ভাবনার ছাত্র-ছাত্রীকেই চাকরি দিয়েছেন। ফলে একটা সময় কোনো এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেবল বামপন্থীই শিক্ষক ভর্তি হয়ে গেল। তখন তাদেরই একাধিক গোষ্ঠী তৈরি হলো। স্যার আশুতোষ মুখার্জির মতো, ঋষি অরবিন্দের মতো শিক্ষাবিদদের বাঙ্গলা একটু একটু করে ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে গেল।

পার্টির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভোটে জেতা। তাই ভোটার লিস্ট থেকে শুরু করে বুথ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক রিগিং করার ব্যবস্থা ভারত- বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিন মুসলমান অনুপ্রবেশকারীকে পশ্চিমবঙ্গে আসতে দেওয়া হলো। ফলে ধীরে ধীরে সীমান্তবর্তী সব জেলাগুলিতে জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে গেল।

গত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ এক নতুন মাত্রা পেল। জেহাদি সন্ত্রাসবাদী চক্র অনুপ্রবেশের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে স্লিপার সেল তৈরি করতে শুরু করল। যেমন শাকিল আহমেদ। শাকিল নদীয়ার করিমপুরে বামদলের সাহায্যে ভোটার লিস্টে নাম তুলেছিল। এরপরে ভারতীয় মেয়েকে সিমুলিয়ার মতো খারিজি, মাদ্রাসার মাধ্যমে সংগ্রহ করেছিল। এরপরে বর্ধমানের কাছে খাগড়াগড়ে ইম্প্রোভাইড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস বানাবার কারখানা তৈরি করেন। ২০১৪ সালের ২ অক্টোবরেই ভীষণ বিস্ফোরণে মারা গেল শাকিল আহমদ। কিন্তু আজও সঠিকভাবে জানা নেই পশ্চিমবঙ্গে কতশত শাকিল আহমেদ কতগুলি স্লিপার সেল তৈরি করেছে? কালিয়াচকের থানা আক্রমণ থেকে শুরু করে সিএএ বিরোধী বিক্ষোভেও এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর উপস্থিতি স্পষ্ট।

মানুষ অনেক আশা করে পরিবর্তনের দিকে তাকিয়ে ছিল। মানুষে মানুষে ভালোবাসা ফিরে আসবে, গরিব মানুষের অর্থ চুরি বন্ধ হবে, পুলিশ প্রশাসন দলদাসের মতো কাজ করবে না। কিন্তু বাঙ্গলার মানুষের দুঃখ যেন চিরসঙ্গী হয়ে গেছে। পরিবর্তনের পরে পরেই যেন পশ্চিমবঙ্গ গরম তাওয়ার থেকে একেবারে গনগনে আগুনের মধ্যে পড়ে গেল।

৩৪ বছরের শাসনে বাঙ্গলা নিজের সমাজকে হারিয়েছিল, আর এই কয়েক বছরে বাঙ্গলা তার চরিত্র হারালো। কয়েক বছর আগেও গ্রাম বাঙ্গলার কোনো এক দরিদ্র মানুষকে কিছু টাকা এমনি এমনি দিলে সে লজ্জা পেত, প্রতিবাদ করত। টাকা নেওয়ার পরে বারবার প্রশ্ন করত যে এই টাকার বিনিময়ে তাকে কী কাজ করতে হবে। ভিক্ষার টাকা বাঙ্গালি নিতে চাইত না। কিন্তু মাত্র কয়েক বছরে বাঙ্গালির এই সম্মানবোধ যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। টাকা দিয়ে ক্লাবের পর ক্লাব, গ্রামের পর গ্রাম, হাজার হাজার মানুষকে কেনা যায় বলে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে। মানুষ যেন মনে করছে অসৎ উপায়ে টাকা নেওয়াটা ঘুষ নেওয়াটা, পরিশ্রম না করে টাকা পাওয়াটাই দস্তুর। গ্রামের থেকে শহরে সর্বত্রই যেন চরিত্র হারিয়েছে বাঙ্গলা।

ইসলামি মৌলবাদ বিগত কয়েক বছরে এরাজ্যে পাকাপাকি জায়গা করে নিয়েছে। সিমির মতো নিষিদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত মৌলবাদী, জামাতের বহুদিনের দায়িত্বে থাকা নেতারা কলকাতায় জেহাদি আক্রমণে প্রকাশ্যে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরাই সংসদ থেকে বিধানসভায় রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাই ইসলামি মৌলবাদ আজ আর এরাজ্যে লুকোছাপা করে কাজ করছে না। কালিয়াচকে থানা লুঠ করে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। স্কুলে স্কুলে সরস্বতী পূজা বন্ধ করে দেওয়া হলো, হিন্দু মেয়েদের ধর্ষণ করে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো, কলকাতার রাস্তায় মিছিল করে কলকাতার মেয়র পদে, পুলিশ কমিশনার পদে মুসলমান করার দাবি করা হলো। ১৯৪৬ সালের মতো ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক পরিবেশ তৈরি হয়েছে আজ পশ্চিমবঙ্গে।

২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার সেন্ট্রাল ফরেনসিক ল্যাবরেটরির অধিকর্তা সি.এন. ভট্টাচার্য এক ভয়ানক তথ্য সংবাদ মাধ্যমের সামনে আনলেন। মাওবাদীরা কাশ্মীরের মুজাহিদিন জঙ্গিদের সহযোগিতায় আফগানিস্তানের তালিবান উগ্রপন্থীদের কাছ থেকে রেডিয়ো কন্ট্রোল্ড এক্সপ্লোসিভ টেকনোলজি আর রিমোট কন্ট্রোল এক্সপ্লোসিভ প্রযুক্তি ভারতে এনেছে। এর মধ্যে ভারতে ঢুকে গিয়েছে প্রচুর বাংলাদেশি জেহাদি অনুপ্রবেশকারী। রাজনৈতিক শক্তি কেবল নিজেদের দুর্নীতি সামলাতেই ব্যস্ত। গদিতে টিকে থাকার জন্য জেহাদিদের সব দাবি মানতে প্রস্তুত। অনুমোদন দেওয়া হলো ১০৪০০ খারিজি মাদ্রাসাকে। সেখানে তৈরি হলো সিমুলিয়ার মতো ভয়াবহ প্রতিষ্ঠান, যেখানে কেবল উগ্র জঙ্গি প্রশিক্ষণই দেওয়া হতো।

এই সাংঘাতিক জেহাদি উন্মাদনার বিস্ফোরণ ঘটল প্রথমে উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গায়, তারপর ক্যানিং মহকুমার নলিয়াখালিতে। বাংলাদেশি লেখিকার নামে কলকাতাতে দাঙ্গা করে তিনদিন অচল রাখা হলো, কলকাতা ময়দানে মুক্তিযুদ্ধে নরসংহারকারী মৌলবাদীদের সমর্থনে মিটিং হলো। এইসব দেশবিরোধী মৌলবাদী কাজের মূল চেহারাগুলিই ছিল উর্দুভাষী

রাজাকাররা। সেই ব্যক্তিরাই ক্ষমতার একেবারে অলিন্দে এসে গেল। পশ্চিমবঙ্গে যেন আবার হুসেন মহম্মদ সোহরাওয়ার্দির শাসন ফিরে এল। খাগড়াগড়ের বিস্ফোরণের প্রমাণ প্রথমে রাজ্য প্রশাসন লোপাট করতে চেষ্টা করেছিল। কালিয়াচক, ধুলাগড়ের একতরফা হিন্দু নির্যাতন পুলিশ নির্বিকার নিশ্চল হয়ে দেখল। নদীয়ার জুড়ানপুরে দিনের আলোয় খুন করা হলো তপশিলি গরিব ভূমিহীন প্রান্তিক হাজরা পরিবারের নিরপরাধ ৩ জন মানুষকে। তারা আজও কোনো ক্ষতিপূরণ পায়নি। স্কুলে স্কুলে সরস্বতী পূজা বন্ধ হলো। সরস্বতী পূজার আবদার করাতে স্কুল ছাত্রীকে মেরে রক্তাক্ত করা হলো।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, সুচেতা কৃপালনীরা বেঙ্গলি হোমল্যান্ড চেয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গকে। সেখানে হিন্দু হয়ে জন্মানোটাই যেন অপরাধ হয়ে উঠল। দারিভিট স্কুলে বাংলাভাষার শিক্ষকের বদলে উর্দু শিক্ষক পাঠানো হলে ছাত্ররা প্রতিবাদ করায় পুলিশ গুলি চালিয়ে দুজন ছাত্রকে হত্যা করল।

হিন্দুদের উপরে এই অত্যাচারে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুর্বল তপশিলি জাতি ও উপজাতির মানুষেরা। মরিচঝাঁপিতে যারা মারা গিয়েছিলেন তাঁদের শতকরা ১০০ জনই নমঃশূদ্র সমাজের। বামফ্রন্ট বিদায়ের ঠিক আগে অসাংবিধানিক ভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রায় সবটুকুকেই অন্য অনগ্রসর শ্রেণী (ওবিসি-এ) করে গিয়েছিল। তথ্যের অধিকার আইনে দেখা গেছে যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিদ্যা বিভাগের মাত্র তিনজন অধ্যাপক পার্টিতন্ত্রের মাধ্যমে চারমাসে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে সার্ভে করেছিলেন। প্রায় ১ কোটি টাকা এই মুষ্টিমেয় কয়েকজন কয়েকমাসে খরচ করে সম্পূর্ণ অসাংবিধানিকভাবে ধর্মভিত্তিক সংরক্ষণ এরাজ্যে চালু করেছিলেন। তারপর কোনো কাগজ প্রমাণ ছাড়াই মুসলমান সম্প্রদায়ের সকলেই এই সুযোগ পায়। এই পাপের ফলশ্রুতিতে সরকারি প্রায় কোনো প্রতিষ্ঠানে এস সি/এস টি রোস্টার ঠিকমত মানা হয় না। বঞ্চিত হতে শুরু করল পশ্চিমবঙ্গে তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের দরিদ্র হিন্দুরা।

যেসব জায়গাতে তপশিলি জাতি ও উপজাতির মানুষেরা সীমান্তবর্তীস্থানে জনবিন্যাসের পরিবর্তন রুখে দিয়েছিল, তাদের চিহ্নিত করে আক্রমণ করা হলো, খুন করা হলো। সন্দেশখালি, গোসাবা তপশিলি জাতি প্রধান, হিঙ্গলগঞ্জও তপশিলি উপজাতির মানুষের আধিক্য, গোসাবাতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জেলা কার্যবাহের বাড়ি সশস্ত্র আক্রমণ হলো। ২০০১ সালে বাসন্তী থানার সোনাখালির মোকামবেড়িয়ার ৪ জন স্বয়ংসেবকের হত্যার অপরাধীরা আজও শাস্তি পায়নি। সেই ধারা সমানে চলেছে। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের পরে পরেই প্রদীপ মণ্ডল, দেবদাসের মতো সাহসী হিন্দু প্রতিবাদী ছেলেদের হত্যা করা হলো সন্দেশখালিতে। হিঙ্গলগঞ্জের অস্বাভাবিক দারিদ্রের জন্য প্রতিনিয়ত শোষিত হচ্ছে তপশিলি উপজাতির হিন্দুরা।

১৯৪৬ সালে অখণ্ড বাঙ্গলায় শতকরা ৪৪ শতাংশ হিন্দু ছিল। এখন বাংলাদেশের ১৬.৪৫ কোটি মানুষের মধ্যে ৮.৫ শতাংশ হিন্দু আর পশ্চিমবঙ্গের ৯.৩ কোটি মানুষের ৭০.৫৪ শতাংশ হিন্দু। তাই সরকারি ভাবে দুই বাংলায় ২৫.৭৫ কোটি বাঙ্গালির মধ্যে ৭.৯৬ কোটি মানে হিন্দুর সংখ্যা কমে হয়েছে ৩০.৯১ শতাংশ। তাই বাঙ্গালি হিন্দু ৩০ শতাংশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে গাণিতিক হিসাবেও বেশিদিন লাগবে না। বাঙ্গালি হিন্দু আজ প্রকৃত অর্থে 'আত্মঘাতী বাঙ্গালি'। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যখন আচার্যকে বের হয়ে যেতে হয়। রাজ্যপাল অপমানিত হন তখন বাঙ্গলার এগিয়ে থাকা সংবাদপত্র হাততালি দেয়। পঞ্চাশ বছর ধরে পূর্ববঙ্গের হতভাগ্য হিন্দু উদ্বাস্তুদের সম্মানজনক নাগরিকত্ব পাওয়ার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চিৎকার করছে এক দুষ্ট চক্র। সামান্য অর্থের প্রলোভনে নিজের সমাজ, ধর্মকে বিক্রি করতে প্রস্তুত। রাজনৈতিক ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য জেহাদিদের সাহায্যে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে, রেল স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড পুড়িয়ে দিতে বা বাস ট্রাকে আগুন লাগাতেও দ্বিধা করছে না। বুঝতে পারছে না স্বামী বিবেকানন্দের, বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গলা ধ্বংস হয়ে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আর কয়েক প্রজন্ম পরে কেউ রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করবে না, সমগ্র বাঙ্গলায় কোথাও শঙ্খধ্বনি হবে না কোনো সন্ধ্যায় তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালানোর মতো কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।

কিন্তু বাঙ্গলার সংস্কৃতির মূলে ছিল অধ্যাত্মবাদ। রাজা রামমোহন রায় আধুনিক ভারতে প্রথম 'হিন্দু কলেজ' স্থাপন করেছেন কলকাতায়। বেদান্তের সারগ্রন্থ তুফাত-উল-মুওয়াহহিদিন লিখেছিলেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরিবারের কুলদেবতা ছিলেন রঘুবীর রামচন্দ্র। জমিদারের হয়ে মিথ্যে সাক্ষ্য দেবেন না বলেই গদাধরের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় রঘুবীরের বিগ্রহ বুকে নিয়ে দৌড়ে গ্রাম ত্যাগ করেছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের অন্যতম গুরু জটাধারী তাঁর বিগ্রহ রামলালাকে ঠাকুরের কাছে দিয়ে গিয়েছিলেন। রামলালা ঠাকুরের সঙ্গে খেলা করতেন, লীলা করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদেশেই স্বামী বিবেকানন্দ সারা পৃথিবীতে হিন্দুত্বের বিজয়তূর্য বাজিয়েছিলেন। বিশ্ববাসী জানতে পারল যে সবধর্ম সমভাবের মূল তত্ত্বই আছে হিন্দুধর্মে। বাঙ্গলা তথা সারা ভারতের জাগরণের কেন্দ্র হয়ে উঠল স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠ।

অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের সঙ্গে লালকাপড়ে বাঁধা থাকত দুটি বই 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' আর 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'। ভগিনী নিবেদিতা হয়ে উঠলেন বিপ্লবীদের প্রেরণাস্থল। তাঁর প্রচেষ্টাতেই ইংরেজ সরকারের হাত এড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন শ্রীঅরবিন্দ।

১৯০৫ সালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম ভারতমাতার চিত্র আঁকলেন। বেদ, বস্ত্র, কমণ্ডলু আর ধান্য হস্তে চতুর্ভুজা গৈরিক বসনা এক দেবী, পদ্মশোভিত সরোবর থেকে উঠে আসছেন। নিবেদিতা এই ছবি নিয়ে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতভক্তি বিস্তারের কথা বলেছিলেন। প্রকৃত অর্থেই স্বদেশি আন্দোলনের উষ্ণতায় বাঙ্গলাদেশের পাড়ায় পাড়ায় তৈরি হয়েছিল ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার 'ভবানী মন্দির'। তাই বাঙ্গলার অগ্নিযুগের স্বদেশি আন্দোলন প্রকৃতঅর্থে ছিল হিন্দুত্বের জাগরণ।

সেই অগ্নিযুগের অগ্নিকুণ্ডে নিজেকে পুড়িয়ে চকচকে ইস্পাতে তৈরি হতে মধ্যভারতের নাগপুর থেকে এসেছিলেন এক মারাঠা যুবক কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার। ন্যাশেনাল মেডিক্যাল কলেজে তাঁর ডাক্তারি পড়াটা ছিল নিছক ছুঁতো। আসলে সে বিপ্লবী হতে চেয়েছিল। পুলিনবিহারী দাসের অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়েছিল কেশবরাও। রামকৃষ্ণ মিশন যখন দামোদর নদীর বন্যায় ত্রাণকার্য করেছিল তখন দিনরাত এক করে সেই দলের হয়ে কাজ করেছিলেন কেশবরাও। তিনি তৈরি করলেন ভারতবর্ষের ইতিহাসের যুগান্তকারী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ।

স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছিতে তৈরি করেছিলেন রামকৃষ্ণ আশ্রম। দারিদ্র্যক্লিষ্ট গ্রামবাঙ্গলার মানুষকে সেবা দেওয়ার জন্য তৈরি করেছিলেন এই আশ্রমকে গঙ্গাধর মহারাজ। এখানে স্বামী অখণ্ডানন্দের শিষত্ব নিয়ে এসেছিলেন মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর। অখণ্ডানন্দজীর তিরোধানের পরে তাঁর নশ্বরদেহ নিয়ে বেলুড় মঠে এসেছিলেন শিষ্য মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর। ইনিই

পরবর্তীকালে হয়েছিলেন সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক। বাঙ্গলার মাটি থেকে উদ্ভূত রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাব আন্দোলনকে শ্রীগুরুজী তাই খুব কাছ থেকে অনুধাবন করেছিলেন। শ্রীগুরুজীর ভাষায় ''শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকলের হৃদয়ে এই বিশ্বাস জাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে আধুনিক শিক্ষার আড়ম্বরকে ছিন্ন করে প্রত্যেকের অন্তরে সৎপ্রবৃত্তি ও সৎজ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত করা সম্ভব। সকল ধর্মের সমন্বয় করে শুধুমাত্র ভারতেরই নয় সমগ্র বিশ্বের মানব সমাজের মধ্যে একাত্মতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হন ওই অবতার। সেইজন্যই তো স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে 'সর্ব-ধর্ম-স্বরূপ' বলে বন্দনা করেছেন। তাঁর সম্পূর্ণ শক্তি এখনও প্রকাশ পায়নি। ঐশী শক্তি ধীরে ধীরে প্রকাশ পাবে।''

তাই এভাবে বোধ হয় শেষ করা যাবে না বীর বাঙ্গলাকে। রাজা প্রতাপাদিত্যের বাঙ্গলা, রাজা গৌরগোবিন্দের বাঙ্গলা, বাঘা যতীনের বাঙ্গলা এত সহজে হার মেনে নেবে না। প্রবল প্রতাপশালী মোগলদের কাছে যাদের পূর্বপুরুষ হার মানেননি, তারা ২০২০ সালে জেহাদি আর তাদের রাজনৈতিক ফেউদের ভয়ে নিজেদের গুটিয়ে নেবে? বাঙ্গালি কেবল সংহত হতে পারলে অসাধ্য সাধন করতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ সেই জাগ্রত বিবেকের প্রতীক। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ২০১৩ সালের ১০, ১১, ১২ জানুয়ারি কল্যাণীর গয়েশপুরে ১৫ থেকে ৪০ বছরের ১০ হাজার হিন্দু যুবকের তিনদিনের শিবির করেছিল। এই ১০ হাজার যুবক স্বামীজীর মন্ত্র নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম থেকে শহরে ছুটেছে। স্বামীজী শিকাগো বক্তৃতার ১২৫ বছর পূর্তিতে এরাজ্য কেঁপে উঠেছে হিন্দুত্বের আহ্বানে। এই তো ২০১৭ সালের ঘটনা।

বাঙ্গালি ছোট্টবেলা থেকে ছড়া কাটে 'ভুত আমার পুত' পেত্নী আমার ঝি, রামলক্ষ্মণ সাথে আছে ভয়টা আমার কী?'

এই ছড়া যে কতটা সত্যি তা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এবার প্রত্যক্ষ করলেন। হিন্দু সমাজ যেদিন শ্রীরামচন্দ্রের নামে পথে নামল সেদিন জেহাদি মৌলবাদ, রাজনৈতিক ধান্দাবাজি, মাওবাদ, উগ্র অসহিষ্ণু বামপন্থা সবাই পাততাড়ি গুটিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। যারা সংবাদ পরিবেশনের নামে মিথ্যার বেসাতি করেন তারা কয়েকদিন 'বাংলার ঐতিহ্য' হারিয়ে গেল, হারিয়ে গেল বলে চিৎকার করতে করতে হাঁপিয়ে উঠলেন। বাঙ্গলার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ তাঁদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন, বাংলাদেশে নরহত্যার সময় আপনারা কোথায় ছিলেন? কলকাতায় ২০০৭ সালে দাঙ্গার সময় আপনারা একটি লাইনও লেখেননি কেন? কলকাতার সংবাদমাধ্যমের সাহস, সততা, গৌরবকে আপনারা ক্ষুদ্র কায়েমি স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়েছেন। এক তরফা মনোভাব আর মেরুদণ্ডহীন সাংবাদিকতার জন্যই আজ পশ্চিমবঙ্গে মৌলবাদ এত ভয়ানক আকার নিয়েছে।

দেশদ্রোহীদের জন্য যেহেতু এটাই শেষ লড়াই, তাই তাদের নৃশংসতাও বাড়বে। গত দেড় বছর সময়ে বাঙ্গলার কত দেশপ্রেমিক তরতাজা প্রাণ মায়ের পায়ে বলিদান হয়েছে। ভাইয়ের সেই তাজা রক্ত নিয়ে কপালে তিলক করে সহস্র বীর আজ আবার স্বামী বিবেকানন্দের সেই মন্ত্র বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করছে, 'গর্ব করে বলো, আমি হিন্দু'। তাদের হৃদয়ে অভয়বাণী বাড়ছে, 'ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত'। এবার বিজয় সুনিশ্চিত।

ফলত এইসব কাণ্ডজে বাঘেদের যেন উপহাস করেই পশ্চিমবঙ্গে রামনবমীর উৎসব, শোভাযাত্রা বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়েছে, গ্রাম থেকে শহরে এরাজ্যে যেন এক সামাজিক উৎসবের চেহারা নিয়েছে। যেখানে যেখানে রামনবমীর শোভাযাত্রা বড়ো হয়েছে হিন্দু সমাজ সুরক্ষিত হয়েছে। রামনাম যেন মৃতপ্রায়, ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজের কাছে সঞ্জীবনী মন্ত্র হিসেবে উঠে এসেছে। ভগবান রামচন্দ্রও যেন বাঙ্গলার এই জাগরণের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তাই এই জাগরণের পরেই যেন ১৭২ বছরের পুরাতন মামলা শেষ হলো। শ্রীরামচন্দ্র যেন কৃপা করেই তাঁর মন্দির নির্মাণের সময়টা বাঙ্গলার নবজাগরণের সময়টাই বেছে নিলেন।

এবছর বাঙ্গলার আর এক অভিশাপের সমাপ্তির বছর। এবার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) কার্যকর হবে। এই আইনে সারা ভারতবর্ষে সবচেয়ে উপকৃত হবেন পূর্ববঙ্গ থেকে আসা বাঙ্গালি উদ্বাস্তুরা। সেই ধর্ষিতা, লাঞ্ছিতা, নিপীড়িত মায়েরা সম্মান পাবেন, যাদের পরিবারের আপনজনকে হারিয়েছেন তারা নিশ্চিন্তে থাকার জায়গা পাবেন। যেসব তপশিলি জাতিভুক্ত গরিব হিন্দু সব হারিয়ে এখানে এসে পুলিশের আর পার্টির নেতাদের ভয়ে থাকতে হবে না। পশ্চিমবঙ্গ আজ হয়ে উঠবে সত্যিকারের 'হিন্দু হোমল্যান্ড'। পশ্চিমবঙ্গের সংগঠিত হিন্দু সমাজ দেশের বাইরের এবং ভেতরের হাঙর ভাঙরের মুখ থেকে শরণার্থী ভাই-বোনদের রক্ষা করে এবার ভারতীয় নাগরিকের মর্যাদা দেবেন।

পশ্চিমবঙ্গের হৃদয় হতে বঙ্গজননী অপরূপ রূপে বাহির হয়েছেন। বীর বাঙ্গালি আর হারবে না। জেহাদের টুঁটি চেপে ধরে, দেশদ্রোহিতার মূল থেকে উৎপাটন করে, রাজনৈতিক ধান্ধাবাজির চিরতরে অবসান ঘটানোর সময় এসেছে। আজ একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, হিন্দু বিরোধী সব শক্তির কাছে, ভারতবিরোধী সব মতবাদের সামনে, পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাছে এটাই তাদের শেষ লড়াই। এই লড়াইতে হিন্দুরাই জিতবেন।

১৯৭৩ সালে অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার সমাপ্তি ভাষণে শ্রীগুরুজী যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার মূল বিষয় ছিল, 'বিজয় হি বিজয়'। এই সর্বস্পর্শী বিষয় বাঙ্গলার পুনর্জাগরণ ছাড়া সম্ভব নয়।

দেশদ্রোহীদের জন্য যেহেতু এটাই শেষ লড়াই, তাই তাদের নৃশংসতাও বাড়বে। গত দেড় বছর সময়ে বাঙ্গলার কত দেশপ্রেমিক তরতাজা প্রাণ মায়ের পায়ে বলিদান হয়েছে। ভাইয়ের সেই তাজা রক্ত নিয়ে কপালে তিলক করে সহস্র বীর আজ আবার স্বামী বিবেকানন্দের সেই মন্ত্র বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করছে, 'গর্ব করে বলো, আমি হিন্দু'। তাদের হৃদয়ে অভয়বাণী বাড়ছে, 'ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত'। এবার বিজয় সুনিশ্চিত।

ভারতে মহিলা উদ্যোগপতিদের সমস্যা

ড. রাজীব কুমার, পাঙ্খুরি ডাট

সারা বিশ্বেই মহিলাদের তুলনায় নতুন কোনো উদ্যোগ শুরু করে পুরুষেরাই। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, মহিলাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কম এবং বিনয়ও বেশি। যেটা তাঁদের ঝুকি নেওয়ার মানসিকতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলে, নতুন কোনো উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সীমাবদ্ধতা থাকে। যদি মহিলারাও পুরুষদের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং অতি আত্মবিশ্বাসী হতেন তাহলে কী হতো? আসলে, আমাদের একেবারেই নিজস্ব ভারতীয় আদর্শ কিরণ মজুমদার-শ তাঁর উদ্যোগপতি হওয়া প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, ''(...) আপনাকে স্থিতাবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে (...)। আমি নিজের জন্য কিছু করছিলাম, আমি যা করছিলাম তা বেশ অভিনব। ওই সময়টায় আমি কোনোদিকে দেখতে পাইনি। আমি বুঝলাম আমি একাই এটা করছি, আমি বুঝলাম আমি অন্য ধরনের কিছু করছি এবং আমি অনেকটাই সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বিষয়টি সামলালাম। একমুখিনতা এবং বোকার মতো সাহস, আমাকে বলতেই হবে।"

দুর্ভাগ্যজনক ভাবে, শুধুমাত্র কম উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে ভারতের মহিলাদের সফল উদ্যোগপতি হতে বাধা দিচ্ছে তাই নয়। ভারতের ১৩.৫ মিলিয়ন থেকে ১৫.৭ মিলিয়নের মধ্যে মহিলা পরিচালিত সংস্থা আছে। সরকারি হস্তক্ষেপে আর্থিক সঙ্গতি বেড়েছে, শিক্ষার সুযোগ বেড়েছে। ফলে গত এক দশকে মহিলা পরিচালিত সংস্থার বৃদ্ধি ঘটেছে ১৪ থেকে ২০ শতাংশ। তবে, মহিলা উদ্যোগপতিদের এমন কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, যা তাদের পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে পরিচিত নয়। মাস্টার কার্ডের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে ব্যবসা করার পরিবেশ মহিলা উদ্যোগপতিদের জন্য অনুকূল নয়। অনেক সামাজিক, কারিগরি এবং আর্থিক বাধা আছে, যা মহিলা পরিচালিত ব্যবসা বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক। বলতে কী, কিছু সংস্থা নথিবদ্ধ হয় মহিলা পরিচালিত হিসেবে আর্থিক এবং প্রশাসনিক কারণে। কিন্তু সেগুলি আসলে পুরুষেরাই চালান। এছাড়া, মহিলা পরিচালিত সংস্থার বেশিভাগই একজন ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আয় হয় কম, আয়তনেও কম, পুরুষচালিত সংস্থার থেকে। বেশিরভাগ মহিলাই বাড়ির কাজের পাশাপাশি, ব্যবসার কাজ চালান। তারা শিশু এবং বৃদ্ধদের যত্ন করার কাজটাও প্রাথমিকভাবে করে থাকেন। মহিলারা যে ব্যবসা করেন তার প্রকৃতি পুরুষচালিত ব্যবসার থেকে ভিন্ন। তাই, ঋণের প্রয়োজনীয়তা এবং সেই সূত্রে ঋণচক্রটিও ভিন্ন রকমের। গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের আবার প্রায়ই তাঁর পরিবারের পুরুষ সদস্যদের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়, বাড়ির বাইরে বেরোবার আগে এবং নিরাপত্তা ও সামাজিক কারণে কাছের ব্যাঙ্কে যেতে হলেও সঙ্গে একজন পুরুষ আত্মীয়কে রাখতে হয়।

মহিলাদের আর্থিক সঙ্গতিও সীমিত বিভিন্ন কারণে। ভারতে এবং বিশ্বেও ব্যবসা শুরু করতে, চালাতে বা বাড়াতে বেশিরভাগ মহিলাই ধার করার চেয়ে সঞ্চয়ের ওপর নির্ভর

কিরণ মজুমদার-শ

করেন। শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত পরিবারের মহিলারাই ঋণের সুযোগ নিয়ে থাকেন। ভারতে কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত কেউ অথবা ছোটো উদ্যোগপতিরা পরিবারের সদস্য অথবা বন্ধুদের কাছ থেকে ধার নিয়ে ব্যবসা শুরু করতে খুব একটা আগ্রহী হন না। এর পাশাপাশি, বাড়ির আয় এবং সঞ্চয়ের ওপর মহিলাদের জোরও কম। সেজন্য তাদের কাছে স্বাধীন আনুষ্ঠানিক আর্থিক উৎসই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে, বিশ্বব্যাঙ্কের গ্লোবাল ফাইন্ডেক্স ডেটাবেস অনুযায়ী, ভারতের মেয়েদের থেকে পুরুষরাই বেশি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ করেন অথবা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে ধার করেন। এই লিঙ্গবৈষম্যের অনেকগুলি কারণ আছে, যেগুলি যুক্ত আর্থিক বাজার এবং পণ্যের সঙ্গে। যদিও মহিলাদের সম্পত্তিতে সমান অধিকার আছে, তবুও তাঁরা সাধারণ পারিবারিক সূত্রে সম্পত্তির মালিকানা পান না। সেজন্যই আনুষ্ঠানিক আর্থিক বাজারে তাদের সীমাবদ্ধতার জন্যই ক্রেডিট রেটিং-এ একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। আর সেজন্যই কম সুদে তাঁরা ধার করতে সক্ষম হন না। এর জন্য প্রয়োজন ঋণদানের এমন ব্যবস্থা করা যেখানে ছোটোখাটো ব্যবসাও ঋণ পাবে, সুদ কম হবে, আর এমন আর্থিক কাঠামো হবে যা মহিলা পরিচালিত ব্যবসার প্রয়োজন মেটাবে।

মহিলা উদ্যোগপতিদের কাছে তথ্যের অসাম্য দূর করার লক্ষ্যে এবং সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নীতি আয়োগের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম মহিলা উদ্যোগপতি মঞ্চ (ডব্লিউ ই পি) একটি কার্যকরি পদক্ষেপ। ব্যবহারকারী এই পোর্টালে নিজের নাম নিবন্ধীভুক্ত করলে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য তো পাবেনই, এছাড়াও প্রয়োজনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের লোকের প্রয়োজন হলে সেই তথ্যও পাবেন। ধরা যাক, কারও ব্যবসায়িক কাজকর্মের জন্য অ্যাকাউন্টেন্টের প্রয়োজন। তখন তিনি এই পোর্টালের সাহায্য নিতে পারেন। এখনও পর্যন্ত এতে ১৩ হাজার নিবন্ধীকৃত উদ্যোগপতি রয়েছেন। উদ্যোগপতিদের অধ্যবসায়, ধৈর্য

এবং কঠোর পরিশ্রমকে সম্মান জানানোর জন্য তারা ২০১৬ সাল থেকে উইমেন ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া পুরস্কার চালু করেছে। শীর্ষস্থানীয় ৩০ জন উদ্যোগপতির মধ্যে থেকে বিজেতার নাম বেছে নেওয়া হবে। এবছর আনুমানিক ২ হাজার ৩০০ উদ্যোগপতি তাঁদের নাম নথিভুক্ত করেছেন, যা উপরে উল্লিখিত চ্যালেঞ্জেরই প্রামাণ্য দলিল। মহিলা মালিকানাধীন এই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির ৬৪ শতাংশ ব্যক্তিগত মালিকানার অথবা এক মালিকানার। অধিকাংশই ৩০ লক্ষ টাকার কম বিনিয়োগে তার ব্যবসা শুরু করেছিলেন এবং ৮৪ শতাংশের বার্ষিক টার্নওভার ১ কোটি টাকার কম। ৮০ শতাংশ কাজ করছে শিক্ষা, সামাজিক ও সমাজের প্রভাব বিস্তার করতে পারে এমন ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর শহরের উদ্যোগপতিরা মূলত শিক্ষা, উৎপাদন, হস্তশিল্প এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে কাজ করেছেন। কৃষি ক্ষেত্রে কাজ করেছেন তৃতীয় শ্রেণীর শহরগুলি থেকে আসা উদ্যোগপতিরা। এই সমস্ত উদ্যোগপতিদের ব্যবসা চালানোর ক্ষেত্রে মূলত তিনটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে। এগুলি হলো— মূলধনের অভাব, সচেতনতার অভাব এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার সমস্যা। সমাজ-সংস্কৃতির চ্যালেঞ্জ এবং লিঙ্গবৈষম্যও ছিল অন্যতম প্রধান সামাজিক চ্যালেঞ্জ। তাঁদের ব্যবসা চালাতে স্বল্প ঋণ দেওয়ার জন্য বিনিয়োগকারীও সেভাবে পাওয়া যেত না।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যের ক্ষেত্রে যে অসাম্য রয়েছে, তা কাটিয়ে ওঠার জন্য ডিজিটাল ব্যবস্থা যথেষ্ট সহায়ক হবে। মহিলারা তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে লেনদেন করার জন্য ইন্টারনেট বা মোবাইল ব্যবহার করতে পারছেন। ব্যাঙ্কের শাখায় গিয়ে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যে সময় নষ্ট হতো বা যাতায়াতের জন্য খরচ হতো তাও বাঁচানো গেছে। এর ফলে উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজকর্মে তাঁরা বেশি মনোনিবেশ করতে পারছেন এবং আর্থিক লেনদেনের খরচও সাশ্রয় হচ্ছে। এই ছোটো ছোটো সঞ্চয়গুলি মহিলাদের ব্যবসায়িক উদ্যোগকে সহায়তা করে। কারণ, এমন অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা কাজ করেন, যেখানে তাঁদের ব্যবসা করতে বা ব্যাঙ্কে যাওয়ার জন্য একা একা বের হতে হয়। তাঁদের জন্য এই ডিজিটাল ব্যবস্থা

ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার আরেকটি সুবিধা হলো ক্লায়েন্টদের সঙ্গে নিয়মিত লেনদেনের সুবিধা। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তিও বৃদ্ধি পায়। ন্যূনতম ব্যালেন্স রাখার প্রয়োজনীয়তা, অন্তর্বর্তীকালীন ঋণ পাওয়ার সুবিধা এবং স্বল্প সঞ্চয়ের সুবিধা ডিজিটাল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে দেওয়া যেতে পারে।

অত্যন্ত সহায়ক। এছাড়াও ব্যবসা চালানোর ক্ষেত্রে যে সমস্ত সামগ্রীর প্রয়োজন হয়, তার সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং বাজার থেকে কোন সামগ্রী কতটা পরিমাণে কিনতে হবে, তা নির্ধারণ করাও সুবিধাজনক হয়। ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার আরেকটি সুবিধা হলো ক্লায়েন্টদের সঙ্গে নিয়মিত লেনদেনের সুবিধা। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তিও বৃদ্ধি পায়। ন্যূনতম ব্যালেন্স রাখার প্রয়োজনীয়তা, অন্তর্বর্তীকালীন ঋণ পাওয়ার সুবিধা এবং স্বল্প সঞ্চয়ের সুবিধা ডিজিটাল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে দেওয়া যেতে পারে। মহিলাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা ঢোকার ফলে তাঁরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হন এবং সেই অর্থ তাঁরা সঞ্চয় করতে পারেন বা ব্যবসায় বিনিয়োগও করতে পারেন। হিসাব নিকাশের রক্ষণাবেক্ষণ, কর প্রদান সুবিধা, সরকারি প্রকল্পগুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং দক্ষ পরিচালন ব্যবস্থা গড়ার ক্ষেত্রে নীতি আয়োগের ডব্লিউ ই পি-কে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রযুক্তি ক্ষমতা আছে মহিলাদের ব্যবসায়িক কাজকর্মের দক্ষতা বাড়ানোর। তবে তাদের কাছে এই প্রযুক্তির নাগাল পাওয়ার সুযোগ সীমাবদ্ধ। ভারতে ডিজিটাল আর্থিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক বড়ো বাধা হচ্ছে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ কম এবং জোরদার ডিজিটাল নেটওয়ার্কের ঘাটতি। এছাড়া, পুরুষের তুলনায় মেয়েদের কাছে মোবাইল ফোন বা ইন্টারনেটের সুযোগও কম। নতুন নতুন আর্থিক পণ্য এবং নয়া প্রযুক্তি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো ও স্মার্ট ফোন ব্যবহারও মহিলারা কম করেন। এটাও দেখা গেছে যে স্যোশাল মিডিয়ার প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতন থাকলেও মেয়েরা তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণে সাহায্য করতে পারে এমন সব আর্থিক হাতিয়ার ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে ততটা অবহিত নয়। দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষ ভেদ কমেছে অনেকখানি, কিন্তু আর্থিক সাক্ষরতায় নারী-পুরুষ বৈষম্য ব্যবসায়িক দক্ষতার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

ব্যবসা-বাণিজ্য উদ্যোগে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর এক কার্যকর উপায় হচ্ছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের কাছে আর্থিক হাতিয়ারের নাগাল পাওয়ার সুযোগ বাড়ানো। তবে, এটা সমাধানের একটি অংশ মাত্র। আরও বেশি কয়েকটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের সংস্কার করা চাই। মহিলা মালিকানাধীন ব্যবসায় সাহায্য করতে সরকার, বেসরকারি ক্ষেত্র এবং লাভের দিকে লক্ষ্য না রেখে চলা সংস্থাগুলি বেশ কিছু প্রকল্প ও উদ্যোগ শুরু করেছে। মহিলা উদ্যোগীদের জন্য সার্টিফিকেশন কর্মসূচি বা দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং মহিলা পরিচালিত অতি ছোটো ছোটো ও মাঝারি সংস্থা থেকে ৩ শতাংশ পণ্য বাধ্যতামূলক কেনা এর কয়েকটি উদাহরণ। শিশু এবং বয়স্কদের জন্য নিরাপদ, সাধ্য কুলোন এবং হাতের কাছে মেলা এক নির্ভযোগ্য পরিচর্যা-অর্থনীতি, স্বাস্থ্য এবং ব্যবসায় বিমা যোজনার মতো সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প এবং ঘর-গেরস্থালির কাজে ছেলে ও মেয়েদের সমান অংশগ্রহণ হচ্ছে এমন কিছু সামাজিক সংস্কার যা আগামী দশকে ভারতের উন্নয়ন কাহিনির এক অংশ হয়ে উঠতে মহিলা উদ্যোগীদের সাহায্য করবে।

— ড. রাজীব কুমার নীতি আয়োগের উপাধ্যক্ষ এবং পাঙ্খুরি ডাট নীতি আয়োগের জননীতি (ইকনোমিক অ্যান্ড ফাইনান্স) পরামর্শদাতা।

অঙ্কের জাদুকর রামানুজন

১৮৮৭ সালের ২২ ডিসেম্বর এশিয়ার শ্রেষ্ঠতম গণিতজ্ঞ রামানুজনের জন্ম। ভারতবর্ষ তখন পরাধীন। তামিলনাড়ুর চেন্নাই থেকে ৩১০ কিলোমিটার দূরে ইরোড়ে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবা শ্রীনিবাস আঙ্গেয়ার মাত্র ২০ টাকায় একটি কাপড়ের দোকানে কাজ করতেন। বড়ো অভাবের সংসার। মা সারঙ্গপাণি গ্রামের মন্দিরে ভজন গাইতেন। তারজন্য ১০ টাকা পেতেন।

চরম দারিদ্র্য, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা কোনো কিছুই তাঁকে গণিতের উচ্চশিখরে উঠা থেকে বিরত করতে পারেনি। পাঁচবছর বয়সে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি হন। দশবছর বয়সে কুম্ভকোণম হাই স্কুলে। সেখানে অঙ্কে শিক্ষকদেরও ভুল ধরতে শুরু করলেন। উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা তাঁর কাছে অঙ্ক বুঝতে আসত। ১৯০৪ সালে স্কলারশিপ নিয়ে ভর্তি হলেন সরকারি কলেজে। সময় পেলেই অঙ্ক কষতে শুরু করেন। খাতার অভাবে মাটিতেই আঁক কষে অঙ্ক করতেন। অঙ্কের সমাধান করা তাঁর নেশায় পরিণত হলো। তারফলে অন্যান্য বিষয়ে রেজাল্ট খারাপ হতে শুরু করল। একারণে তাঁর স্কলারশিপ কাটা গেল। তিনি এফএ পরীক্ষায় ফেল করলেন। পাশ করলে মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারতেন।

মাতৃভক্ত রামানুজন ১৯০৯ সালে মায়ের ইচ্ছায় বিয়ে করলেন। অঙ্কটা ভালো বুঝতেন বলে পোর্ট ট্রাস্টে ৩০ টাকা মাইনের একটা চাকরি পেলেন। খাওয়াপরার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ায় আবার অঙ্কে নেশায় ডুবে গেলেন।

সেসময় কেমব্রিজের ট্রিনটি কলেজের প্রফেসর বিখ্যাত গণিতজ্ঞ হার্ডি সাহেব। রামানুজন তাঁকে চিঠিতে পাঠালেন নিজের তৈরি অঙ্কের কয়েকটি ফর্মূলা। হর্ডি ও তাঁর বন্ধু লিটিলউড খুব ভালোভবে তা পড়ে বুঝতে পারলেন যে

কেরানি ছেলেটি এই ফর্মূলা পাঠিয়েছে সে নিঃসন্দেহে একটি জিনিয়াস। তাঁরা রামানুজনকে ইংল্যান্ডে আনার ব্যবস্থা করলেন। সেইমতো রামানুজন ১৯১৪ সালে ইংল্যান্ডে পৌঁছে গেলেন। গ্র্যাজুয়েট না হলে তো গবেষণা করা যাবে না। তাই তাঁরা তাঁকে ট্রিনটি কলেজে ভর্তি করানো হলো। সেখানকার শিক্ষকরা খুব শীঘ্রই বুঝতে পারলেন যে, ভারতের এই ছেলেটি অঙ্কের জাদুকর। নিমেষের মধ্যেই কঠিন সব অঙ্কের সমাধান করে ফেলতে পারে। ১৯১৬ সালে তিনি বিএসসি পাশ করলেন। এরপর তিনি গবেষণায় মগ্ন হলেন। ক্রমে ক্রমে সেখানকার বিভিন্ন জার্নালে তাঁর ২১টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হলো। তার মধ্যে ৫টি অধ্যাপক হার্ডির সঙ্গে যৌথভাবে। ১৯১৮ সালে তিনি ফেলোশিপ পেলেন রয়্যাল সোসাইটি এবং ট্রিনটি কলেজের। তিনিই রয়্যাল সোসাটির প্রথম ভারতীয়।

পশ্চিমের জলহাওয়া আর কঠোর পরিশ্রমে তিনি অচিরেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ১৯১৯ সলের ১৩ মার্চ তিনি দেশে ফিরে এলেন। কিন্তু ভালো খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবে দুরারোগ্য টিবি রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ১৯২০ সালে মাত্র ৩২ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। অপার প্রশংসা সত্ত্বেও তাঁকে কোনোরূপ অহংকার স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। পরিবার ও সমাজে তাঁর ব্যবহার ছিল একজন অতি সাধারণ মানুষের মতোই।

ভারত সরকার রামানুজনের জন্মদিনটিকে 'ন্যাশনাল ম্যাথেমেটিকস ডে' হিসেবে ঘোষণা করেছে। ত্রিপুরা সরকার দিনটিতে 'রাজ্য গণিত দিবস' হিসেবে পালন করে। আজ কোয়ান্টাম ফিজিক্স , ব্ল্যাকহোল এবং স্ট্রিং থিয়োরি সব কিছুতেই তাঁর ফর্মূলা প্রয়োগ হচ্ছে। তাঁর সময়ে কিন্তু ব্ল্যাকহোলের কথা কেউ জানতই না। রামানুজনের জীবন থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, দারিদ্র্য কোনো কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। শুধু চাই প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও সংগ্রাম করার মানসিকতা। আর তা থাকলেই পরিবার ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করা যায়। মা সরস্বতীর বরপুত্র রামানুজন তার জ্বলন্ত উদাহরণ। সবার বড়োলোকের ঘরে জন্ম নেওয়ার সৌভাগ্য হয় না। যে সব প্রতিকূলতাকে জয় করে জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে পারে সেই প্রকৃত বীর। তাই রামানুজনের জীবন আমাদের কাছে আলোকবর্তিকা স্বরূপ।

শুভময় হালদার

ভারতের পথে পথে

মাণ্ডী

হিমাচলের বাণিজ্যিক শহর মাণ্ডি। বহু আগে বণিকরা এই মাণ্ডি হয়েই তিব্বতে যেত। মাণ্ডির ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক গুরুত্ব রয়েছে। শহরের তরণা পাহাড়ে ১৬০টি সিড়ি উপরে উঠে কারুকার্য মণ্ডিত সোনায় অলংকৃত শ্যামকালী বা তরণামাতা মন্দির। কালো পাথরের বিগ্রহ। রয়েছে নাগরী শৈলীর ত্রিলোকনাথ মন্দির। বিগ্রহ ত্রিভুবনেশ্বর শিব। রয়েছে অর্ধনরীশ্বর মন্দির, ভূতনাথ মন্দির। এখানে শিবরাত্রিতে সপ্তাহ ব্যাপী উৎসবে পুণ্যার্থীরা আসেন দূরদূরান্ত থেকে। সপ্ত হ্রদের দেশ মাণ্ডীর অন্যতম আকর্ষণ ২৪ কিলেমিটার দূরে ১৩৬০ মিটার উচ্চে হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ তীর্থ রিওয়ালসর লেক। চার পাশে সবুজ পাহাড়ের ব্যূহ। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, আজও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর-সহ সমস্ত দেবতা এই লেকের জলে স্নান করতে আসেন। গুরু গোবিন্দ সিংহ হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে এখানে এক মাস অবস্থান করেন। তারই স্মারক রূপে রয়েছে গুরুদ্বারা। বাসস্ট্যান্ডের পাশে র য়েছে বৌদ্ধবিহার, লোমশমুনি মন্দির, কৃষ্ণ মন্দির ও শিবমন্দির।

জানো কি?

বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের নাম

- ভারত—সংসদ
- বাংলাদেশ—জাতীয় সংসদ
- পাকিস্তান— মজলিস-ই-সুরা।
- সুইজারল্যান্ড—ফেডারেল অ্যাসেম্বলি।
- ইজরায়েল—নেসেট।
- নেপাল—রাষ্ট্রীয় পঞ্চায়েত।
- জাপান—ডায়েট।
- নরওয়ে—স্টরটিং।
- সুইডেন—পিকসডাগ।
- ডেনমার্ক—কোকেটিং।
- রাশিয়া— ডুমা
- চীন– ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস।

ভালো কথা

পলাশের আবির

সেদিন স্কুলে স্যার বললেন এবার বাজারের আবির দিয়ে রং খেলা বারণ। বাজারে বেশিরভাগ আবির চীন থেকে নাকি আসে। স্যারেরা বলে দিয়েছেন পলাশফুল কুড়িয়ে এনে রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে ঝিনুক পুড়িয়ে পাউডার করে মিশিয়ে নিলেই আবির তৈরি হয়ে যাবে। সেইমতো আমাদের পাড়ার সবাই আবির বানিয়েছে। বাবা বলল অনেক গ্রামে ঘুরে ঘুরে স্যারেরা এভাবে আবির বানানোর প্রচার করেছেন। তাই সব গ্রামে এভাবেই আবির তৈরি হচ্ছে। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে এবার আমরা নিজের হাতে বানানো আবির দিয়ে হোলি খেলব। আমাদের বাজারে এই আবির বিক্রিও হচ্ছে। কলকাতার ব্যবসায়ীরা নাকি খোঁজ নিয়ে গেছে।

পূর্ণিমা কুমার, অষ্টম শ্রেণী, আড়ষা, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

করোনা দমন

পায়েল সরকার, নবম শ্রেণী, মোহনবাটি, রায়গঞ্জ, উঃ দিঃ।

করোনা ভাইরাস হবে দমন
কতকগুলি নিয়ম করলে পালন।
হ্যান্ডসেক করবে না, হাত না ধুয়ে খাবে না
ভিড়ের মধ্যে যাবে না, চোখে-মুখে হাত দিবে না।

বাসি খাবার খাবে না, পরিবেশ নোংরা করবে না
হাঁচি-কাশিতে রুমাল চাপা, আজেবাজে খাবে না।
এসব শুধু সাবধানতা, তবু ভয় যায় না
করোনার মারণরোগে ধুঁকছে আজ চায়না।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ২৭।।

রাষ্ট্রচিন্তায় মগ্ন

রাজগীরে শুশ্রূষায় কোনো লাভ হলো না। এরপর তিনি শরীরের চিন্তা ছেড়ে দিলেন। আগের মতোই সফর শুরু করলেন। ১৯৪০-এর ২৯ এপ্রিল পুণায় সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গে পৌঁছালেন। সেখানে পরিচায়াত্মক বৈঠক নিলেন। খুব ভালো বৌদ্ধিক দিলেন। স্বয়ংসেবকদের দেখেও তিনি আনন্দ পেলেন।

পুণার বর্গে মহারাষ্ট্রের প্রাদেশিক বৈঠক হলো। তাতে স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকরজী উপস্থিত ছিলেন। তিনি শুভেচ্ছা জানালেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ দেশের একমাত্র আশার আলো। আপনারা নিজেদের নেতার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখবেন।

২৫ মে ডাক্তারজী পুণা থেকে চলে গেলেন। ট্রেন ছাড়তে করজোড়ে নমস্কার করলেন সবাইকে।

আচ্ছা, আমি তাহলে চলি!

নাগপুর স্টেশনে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে শ্রীগুরুজী, কৃষ্ণরাও মোহরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীগুরুজী মালা নিয়ে এসেছিলেন। ডাক্তারজীকে পরাতে যাবেন, সেইসময় ডাক্তারজীর ইশারা গুরুজী বুঝতে পেরে পাশে দাঁড়ানো বাবুয়াজীকে সেই মালা পরিয়ে দিলেন।

চলবে

উত্তর-পূর্বে দুটি ঐতিহাসিক চুক্তি

এ সূর্য প্রকাশ

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার এবং সীমিত কিছু ব্যক্তির পক্ষ থেকে এই আইন প্রত্যাহারের ক্রমাগত দাবি ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও নরেন্দ্র মোদী সরকার নীরবে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির সংখ্যালঘু ও জাতিগত বৈরিতা সম্পর্কিত দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলির সমাধানে কাজ চালিয়ে গেছে।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন যখন রোজ শিরোনামে উঠে এসেছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ সেই সময় অর্ধ শতাব্দী পুরনো বোড়ো সমস্যা এবং ত্রিপুরায় ব্রু-রিয়াং জনজাতির মানুষের পুনর্বাসন সংক্রান্ত দুই দশকেরও বেশি পুরনো সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

বোড়ো জনজাতি সম্পর্কিত জাতিগত দ্বন্দ্বের ফলে ৪ হাজার মানুষের জীবনহানি হয়েছে। সম্প্রতি স্বাক্ষরিত চুক্তির ফলে জটিল এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব হয়েছে। ভারত সরকার, অসম সরকার ও বোড়ো প্রতিনিধিদের মধ্যে ঐতিহাসিক চুক্তির অঙ্গ হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার বোড়ো অঞ্চলে নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রকল্পের জন্য দেড় হাজার কোটি টাকার উন্নয়নমূলক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। এই চুক্তির প্রেক্ষিতে প্রায় ৫০০ সশস্ত্র জঙ্গি হিংসার পথ পরিহার করে সমাজের মূলস্রোতে শামিল হবে। চুক্তি স্বাক্ষরের পর সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বোড়ো জনজাতির মানুষের পক্ষ থেকে দাবি জানিয়ে আসা বিষয়গুলির এক সুসংবদ্ধ ও চূড়ান্ত সমাধানসূত্র মিলেছে। এখন বহু বছরের সংগ্রামের পর বোড়ো জনজাতির মানুষ হিংসার পথ ছেড়ে, অস্ত্র সমর্পণ করে এবং সশস্ত্র সংগঠনগুলিকে ভেঙে দিয়ে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসবে। কেন্দ্র ও অসম সরকার দেড় হাজার বোড়ো ক্যাডারের পুনর্বাসনে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ঐতিহাসিক বোড়ো চুক্তি স্বাক্ষরের কয়েকদিন আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ নতুন দিল্লিতে ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু হিসবে বসাসকারী ব্রু-রিয়াং উপজাতির মানুষের ২৩ বছরের পুরনো সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার, ত্রিপুরা সরকার, মিজোরাম সরকার এবং ব্রু-রিয়াং প্রতিনিধিদের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। এই চুক্তি ত্রিপুরায় ব্রু-রিয়াং সমস্যার স্থায়ী নিষ্পত্তিতে কার্যকর ভূমিকা নেবে এবং এই জনজাতিভুক্ত মানুষের পুনর্বাসনে ৬০০ কোটি টাকা খরচ করা হবে।

ব্রু-রিয়াং উদ্বাস্তুদের সমস্যা দু'দশকেরও বেশি পুরনো। এই সমস্যার সূচনা ১৯৯৭ সালে মিজোরামে জনজাতিগত উত্তেজনার দরুন। এই ঘটনার ফলে, প্রায় ৫ হাজার পরিবারের ৩০ হাজার ব্যক্তি রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে এসে ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু হিসেবে বসবাস শুরু করেন। উত্তর ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু হিসাবে আসা এই মানুষজনের অস্থায়ী শিবির তৈরি হয়। বাস্তুচ্যুত এই জনজাতি সমাজের মানুষের সমস্যা দীর্ঘদিনের। তবে, ব্রু-রিয়াং জনজাতির উদ্বাস্তু মানুষের পুনর্বাসনে ২০২০ সাল থেকেই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। উদ্বাস্তু ওই ৫ হাজার পরিবারের মধ্যে প্রায় ১ হাজার ৬০০ পরিবারকে মিজোরামে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই কাজে ত্রিপুরা ও মিজোরাম সরকারকে সাহায্য করার উদ্যোগ নেয়। মোদী সরকার ২০১৮'র জুলাই মাসে এ ব্যাপারে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেয়। সেই সময় সরকার উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে প্রদেয় সহায়তা বাড়াতে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই প্রেক্ষিতে ৩২৮টি পরিবারের ১ হাজার ৩৬৯ জন ব্যক্তি মিজোরামে ফিরে যান। অবশ্য, এরপরও ব্রু-জনজাতির মানুষ একটি স্থায়ী সমাধান দাবি করে আসছিল, যাতে তাঁরা স্থায়ীভাবে ত্রিপুরাতেই স্থিতু হতে পারেন। তাঁরা মনে করেছিলেন, ত্রিপুরাতেই তাঁরা বেশি নিরাপদ। সর্বশেষ এই চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে ত্রিপুরার ৬টি শিবিরে বসবাসরত প্রায় ৩৪ হাজার ব্রুরিয়াং জনজাতির মানুষ লাভবান হবেন।

ত্রিপুরার আদিবাসী গবেষণা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের তথ্য অনুযায়ী,

ফ ঃ ৬

রিয়াংরা ত্রিপুরার দ্বিতীয় বৃহত্তম জনজাতি সম্প্রদায়। এমনকী, এই সম্প্রদায়ের মানুষজন ভারতে ৭৫টি আদিম জনগোষ্ঠীর অন্যতম একটি। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয় যে, এই রিয়াংরা এসেছেন মায়ানমারের শান রাজ্য থেকে। এরা প্রথম চট্টোগ্রামের পার্বত্য এলাকায় এসে পৌঁছন, পরে তাঁদের ত্রিপুরায় প্রবেশ। এছাড়াও, আরও একটি জনজাতি গোষ্ঠী রয়েছেন, যাঁরা অষ্টাদশ শতাব্দীতে অসম ও মিজোরাম থেকে ত্রিপুরায় আসেন।

ত্রিপুরার এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে যে, রিয়াং জনজাতি মানুষের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৮৮ হাজার। এদের মধ্যে দুটি প্রধান গোষ্ঠী রয়েছে—মেসকা ও মলসই। এরা এখনও যাযাবর শ্রেণীর। এদের অধিকাংশই পাহাড়ি এলাকায় ঝুম চাষের ওপর নির্ভরশীল। এদের কথ্য ভাষা হলো কাউব্রু। এমনকী এদের অধিকাংশই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। এদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। 'হোজাগিরি' নৃত্য অত্যন্ত পরিচিত সংস্কৃতি হিসেবে বিবেচিত হয়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছাড়াও ঐতিহাসিক এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা, উত্তর-পূর্ব ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্সের সভাপতি হিমন্ত বিশ্বশর্মা, ত্রিপুরার রাজ পরিবারের প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা এবং ব্রু জনজাতির প্রতিনিধিরা।

চুক্তি অনুযায়ী, ত্রিপুরায় বসবাসরত প্রতিটি ব্রু-পরিবার জমি পাবেন। ৪ লক্ষ টাকার ফিক্সড ডিপোসিট এবং দু'বছরের জন্য প্রতি মাসে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত নগদ অর্থ সাহায্য পাবেন। এছাড়াও, প্রতিটি পরিবারকে বিনামূল্যে দু'বছর রেশন এবং বাড়ি নির্মাণে দেড় লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। ত্রিপুরা সরকার বাড়ি নির্মাণে জমি দেবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ কয়েক মাস আগে যখন ব্রু জনজাতি মানুষের সমস্যা মোকাবিলায় ত্রিপুরা ও মিজোরাম সরকার সহ ব্রু-জনজাতির মানুষকে এক জায়গায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ঠিক তখনই মন্ত্রকের পক্ষ থেকেও প্রয়োজনীয় প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া হয়। শ্রীশাহ ত্রিপুরাতেই ব্রু-জনজাতি মানুষের স্থায়ী বসবাসের বিষয়টিকে সমর্থন যোগানোর জন্য ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সঙ্গে এবং ব্রু-জনজাতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেন। সম্প্রতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর শ্রীশাহ বলেন, এই সাফল্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিসওয়াস' নীতির প্রতিফলন। উত্তর-পূর্বে দীর্ঘ বকেয়া বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারের বিষয়টিও এই চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়।

উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিকে উন্নয়নের সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যেতে এই অঞ্চলের দীর্ঘ বকেয়া সমস্যাগুলির সমাধানে নরেন্দ্র মোদী সরকারের আগ্রহ ও আন্তরিকতাই এই চুক্তি দুটি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট হয়।

অবশ্য, সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের ইতিবাচক দিকগুলি পুরোপুরি বিস্মৃত হয়ে সীমিত সংখ্যক অনিচ্ছুক কিছু ব্যক্তি ক্রমাগত অকারণে বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন। ■

করজোড়ে নমস্কার, একটি সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নরেন্দ্র মোদীর

স্বপন কুমার ভৌমিক

বর্তমানে করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক সারা বিশ্বজুড়ে। এই ভয়াবহ রোগের করালগ্রাসে আক্রান্ত হয়েছে লক্ষাধিক মানুষ, মারা গেছে কয়েক হাজার। এর সংখ্যা চীনেই বেশি। এই রোগের প্রাদুর্ভাব প্রাচ্য ছাড়িয়ে পাশ্চাত্যে গিয়ে হানা দিয়েছে। এটা বড়োই উদ্বেগের বিষয়। বর্তমানে করোনা ভাইরাসের ভয়ে অনেক দেশই ভিসা বন্ধ করে দিয়েছে। সঙ্গে বন্ধ হয়েছে নেতা-নেত্রীদের বিদেশযাত্রা। এই ভয়াবহ রোগ থেকে বাঁচতে ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটা চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। করোনা ভাইরাসের মতো ভয়াবহ রোগ যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে তার জন্য করমর্দন ও কোলাকুলি নিষিদ্ধ হয়েছে। এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে আমেরিকা, ইজরায়েল, জার্মানি, ইংল্যান্ড। এরা সবাই আপত্তি তুলেছে এই করমর্দন রীতির। কারণ স্পর্শের মাধ্যমেই এই রোগটি ছড়াতে পারে বলে আশঙ্কা। তাই ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ভারতের সনাতন এবং বৈদিক নীতিকে সমর্থন করেছেন, যেমন মুখে নমস্কার বা নমস্তে সঙ্গে দুই হস্ত জোর করে। এই সনাতন পদ্ধতির মধ্যে অবশ্যই বিজ্ঞান নিহিত, যেটা যুগযুগ ধরে বহু মানুষ প্রতিপালন করছে। এর মধ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন ভারতে এসেছিলেন তখন এই মহান ব্যক্তি নমস্তে কথাটিকেই আঁকড়ে ধরে সবাইকে সম্বোধন করেছেন। এরপরে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীও এই সনাতন পদ্ধতিকে সহমত দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আমি একটি কথা অবশ্যই বলব 'নমস্কার' এবং 'নমস্তে' বেশিরভাগ ভারতীয়রাই বলে থাকে। কিন্তু এটাকে কেউ কেউ অস্বীকার করলেও দু' হাত জোড় করে মানুষকে সম্ভাষণ জানানো কখনোই ধর্মীয় রীতি নয়। কারণ এটা সম্পূর্ণ হৃদয় গঠিত এবং স্নায়বিক পরিকাঠামোর সঙ্গে জড়িত। দু' হাত জোড় করলে মানুষের হৃদয় এবং স্নায়ু একসঙ্গে কাজ করতে শুরু করে। এটার অর্থ নিজেকে অপরের কাছে সমর্পণ করা, হৃদয়ের অনুভূতিকে অপরের কাছে বিলিয়ে দেওয়া। যেমন মানুষ যখন অপরাধ করে তখন হৃদয় ও স্নায়ু একসঙ্গে জুড়ে যায়, মানুষের দেহে উষ্ণ স্রোত বইতে শুরু করে। তখন দুই হস্ত একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয় এবং অপর ব্যক্তিকে বুঝিয়ে দেয়, আমি সত্যিই ব্যথিত ও আবেগাপ্লুত, তোমার স্মরণে আসতে চাইছি, এটা অপরাধের ক্ষেত্রে। তেমনি অপর পক্ষে আর একটা জিনিস কাজ করে, এই জোড় হাতের মাধ্যমে সেটার অর্থ, আমি তোমার হৃদয়ের সঙ্গে এক হতে চাইছি, তাই আমার দেহের উষ্ণ স্রোত তোমার মধ্যেও প্রবাহিত হোক বা ঝড় তুলুক। তাই অন্য কিছুতে সংস্কার থাকলেও জোড় হাতের মধ্যে হৃদয়ের নেওয়া দেওয়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সনাতন পদ্ধতি নিয়ে কোনো বিরূপ মন্তব্য শোভনীয় নয়। প্রত্যেকেরই এটা গ্রহণ করা উচিত বলে আমি মনে করি।■

যেখানে নারী পূজিত হন, সেখানে ঈশ্বর বিরাজ করেন

নীতীন গড়করি

স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন, 'কোনও জাতির উন্নতির মাপকাঠি সেই জাতির মহিলাদের প্রতি ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে। ভারত তার হৃতগৌরব তখন ফিরে পাবে, যখন ভারতীয়রা নারীদের অবস্থার উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা করবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নতুন ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো নারী ক্ষমতায়নে সর্বাঙ্গীণ উদ্যোগ গ্রহণ এবং আমাদের সমাজের বিভিন্ন অংশের অবহেলিত মহিলাদের উন্নতিসাধন।

আমার নিজের মন্ত্রক— অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রকে আমরা মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে যথেষ্ট সুযোগের সদ্ব্যবহার করছি। ১২ হাজারেরও বেশি তপশিলি জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত শিল্পোদ্যোগী মহিলা 'জাতীয় তপশিলি জাতি, উপজাতি হাব কনক্লেভস্' এবং 'দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি'তে অংশগ্রহণ করেছেন। আমাদের কয়েকটি উদ্যোগ হলো :

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির সংগ্রহ নীতি : অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রকের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির সংগ্রহ নীতির আওতায় অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগীদের কাছ থেকে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি যে ২৫ শতাংশ সামগ্রী সংগ্রহ করে তার মধ্যে ৩ শতাংশ মহিলা শিল্পোদ্যোগীদের কাছ থেকে সংগ্রহ বাধ্যতামূলক।

মহিলা কয়্যার যোজনা : কয়্যার বোর্ড মহিলা কয়্যার যোজনাকে বাস্তবায়িত করছে। এখানে মহিলা কারিগরদের নারকেল ছিবড়ে দিয়ে দড়ি বানানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে তাঁরা স্বাবলম্বী হতে পারেন। প্রশিক্ষণকালে তাঁদের প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ প্রাপকদের কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। প্রকল্পগুলির সর্বোচ্চ ব্যয় ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে হতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প (পিএমইজিপি) স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে ভরতুকিযুক্ত এই প্রকল্পে শিল্পোদ্যোগীরা যে অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকেন, সেখানে গ্রামীণ এলাকায় প্রকল্পের ২৫ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে প্রকল্পের ১৫ শতাংশ আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকেন।

মহিলা-সহ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী, ভিন্নভাবে সক্ষম, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, পার্বত্য ও সীমান্ত এলাকার যেসব বাসিন্দা গ্রামে থাকেন, তাঁদের ৩৫ শতাংশ ভরতুকি এবং শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ ভরতুকি মন্ত্রক দিয়ে থাকে। মন্ত্রকের বাজেট নীতি অনুসারে, ৩০ শতাংশ অর্থ মহিলা শিল্পোদ্যোগীদের জন্য বরাদ্দ থাকতে হবে।

খাদির রুমাল তৈরি : খাদি গ্রামোদ্যোগ শিল্পের উদ্যোগে জম্মুর নাগ্রোটায় খাদি রুমাল সেলাই কেন্দ্র গড়ে উঠেছে, যেখানে সন্ত্রাসবাদের শিকার পরিবারগুলি মহিলারা কাজের সুযোগ পেয়ে থাকেন। খাদি গ্রামোদ্যোগ শিল্প এই কেন্দ্রকে রুমাল তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করে থাকে। ১২৫ জন মহিলা প্রতিদিন ৭ হাজার ৫০০টি রুমাল তৈরি করে। এই রুমালগুলি অনলাইনে বিক্রি করা যায়। প্রত্যেক মহিলা দৈনিক চার ঘণ্টা কাজ করে ১৫০ টাকা উপার্জন করেন। খাদির রুমাল প্রতি বছর ২ কোটি বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। এই রুমালগুলির দাম ৫০ টাকা করে।

মহিলাদের সবরকমের নিরাপত্তা : শারীরিক, স্বাস্থ্য, সামাজিক, আর্থিক এবং অধিতবিদ্যা সংক্রান্ত নিরাপত্তার ওপর সরকার গত সাড়ে পাঁচ বছর ধরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এর ফলে, আমাদের মা, বোন ও মেয়েদের আত্মসম্মান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। মহিলাদের সুরক্ষা বৃদ্ধির অঙ্গ হিসাবে ১২ বছরের কম বয়সি বালিকাদের বলাৎকার করলে অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া নিশ্চিত করা হয়েছে। ১৬ বছরের কম বয়সি বালিকাদের যদি কেউ বলাৎকার করে, তা হলে তাকে ১০-১২ বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। সাংবিধান অধিকার অনুযায়ী, সাম্যের প্রকৃত অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমাদের সরকার মুসলমান মহিলাদের পুরুষ ছাড়াই হজ যাত্রার অনুমতি দিয়েছে। তিন তালাকের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা মহিলাদের সামাজিক নিরাপত্তার আরেকটি মাইলফলক। সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি ১২ সপ্তাহ থেকে বাড়িয়ে ২৬ সপ্তাহ করা হয়েছে। মিশন ইন্দ্রধনুষ প্রকল্পের আওতায় ৮০ লক্ষ গর্ভবতী মহিলাকে টিকাকরণের আওতায় আনা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযানে ১ কোটি ১৬ লক্ষ সন্তানসম্ভবা মহিলার স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। আমাদের সরকারের 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' নীতি গ্রহণের ফলে ১০৪টি জেলায় লিঙ্গ অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৪৬টি জেলায় প্রাতিষ্ঠানকভাবে শিশুদের জন্ম দেওয়ার ফলে মা ও সদ্যোজাত উভয়ই উপকৃত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনার আওতায় গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মহিলাদের ৬ হাজার টাকা করে আর্থিক সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রাম ও আধা-শহরের ৫ কোটি ৩৩ লক্ষ দরিদ্র মহিলার ধোঁয়াহীন জীবন নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর মুদ্রা যোজনা এবং নতুন উদ্যোগ স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া থেকে ৯ কোটি মহিলা শিল্পোদ্যোগী ঋণ পেয়েছেন। সুকন্যা সমৃদ্ধি অ্যাকাউন্ট ১ কোটি ২৬ লক্ষ খোলা হয়েছে। এর ফলে, শিশু কন্যাদের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য ২০ হাজার কোটি টাকা জমা পড়েছে। আমি সমস্ত দেশবাসী, বিশেষ করে মায়েদের কাছে অনুরোধ করবো, আপনার কন্যা সন্তানের জন্ম হলে ৫টি চারা রোপণের মধ্য দিয়ে তা উদ্‌যাপন করার প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা আপনারা বাস্তবায়িত করুন।

(লেখক কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ, মহাসড়ক এবং অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রী)

কাদের চক্রে পড়ে তরুণ-তরুণীরা দিশাহারা হয়ে পড়ছে?

সৌম্যজিৎ মাইতি

তরুণ প্রজন্মকে ভালো রাখার বা তাদের ভালো থাকার মুখোশ খুলে গিয়ে আসল মুখ প্রকাশিত হয়ে গেছে...এসবই কি সামাজিক মাধ্যমের অবদান! রোদ্দুর রায়কে দোষ দিয়ে সবাই আবার ভালো মানুষির খোলসে আশ্রয় নিতে চাইছে। ভেবে নেবেন না আমি রোদ্দুর রায়ের সমর্থক। এখন বিদ্যালয়ের গণ্ডি ছাড়তে না ছাড়তেই অপরিণত মনস্ক শিক্ষার্থীদের হাতে ব্যাগে বই-খাতা-পেনের সঙ্গে ঝাঁ চকচকে অতি আধুনিক স্মার্ট ফোন। বিশ্ববিদ্যালয়েও এখন আর শ্রেণীকক্ষে খাতার ওপর পেন চলে না...মোবাইলের টাচ স্ক্রিনের ওপর সারাক্ষণ আঙুল চলে। আর চলে নিজস্বীতে নিজ গ্ল্যামারকে বন্দি করতে সদা ব্যস্ততা! একটা মানসিক ভাবে অস্থিতিশীল অর্ধ উন্মাদ লোক...কী না কী আপলোড করে চলেছে... আর সেটা ভাইরাল হচ্ছে। ভাইরালটা করছে কারা... যারা আজকে গেল গেল রব তুলছে... কমেন্টস এ নানা মন্তব্য লিখছে। আমাদের চলাফেরার আশেপাশে কতরকম পাগল, অর্ধ পাগল কত কী বলে... কী করে বেড়ায়। সেগুলি কি সবাই পাত্তা দিই; নাকি ওইসব লোকেদের পিছু পিছু নিজেদের কাজ জলাঞ্জলি দিয়ে ঘুরে বেড়াই? নাকি তাকে নিয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিচিতদের সঙ্গে শেয়ার করি? রবীন্দ্র ভারতী ও মালদার বার্লো গার্লস হাই স্কুলের দৌলতে এবারের বসন্ত উৎসবের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে যেন বসন্তের (পক্স) ছোঁয়া! প্রতিবাদ উঠেছে সর্বস্তরে। এটার দরকার ছিল বই কী! নাহলে এই ধরনের বেলেল্লাপনার সীমানা নির্ধারণ করে দাঁড়ি ফেলা যাচ্ছিল না। ভবিষ্যৎ বলবে এই দাঁড়ির মেয়াদ কতদিন থাকবে।

নারী তোমার স্বাধীনতা কীসে! মুক্তি কীসে! তোমার উন্মুক্ত পিঠে লেখার মধ্যে? রবীন্দ্র সংগীতকে বিকৃত করে গান গাওয়ার মধ্য দিয়ে? শরীরকে কতটা অনাবৃত করে নানা অঙ্গ-বিভঙ্গ দেখিয়ে প্রতিযোগিতায় থাকা যায় তার মধ্য দিয়ে? সামাজিক মাধ্যমে অশ্লীল অভব্য কিছু আপলোড করে? নাকি ঘরের পশ্চিম দিককে পুরো উন্মুক্ত করে দিয়ে পশ্চিমি হাওয়া বা ঝড়ে নিজ ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে শিকড় সুদ্ধু উপড়ে ফেলার মধ্য দিয়ে? সেটা কিন্তু তোমাকেই ঠিক করে নিতে হবে।

২০১৯-এর মে মাসে এই রাজ্য প্রত্যক্ষ করেছে ঘৃণ্য রাজনৈতিক পরিসরে বিদ্যাসাগরের মূর্তির অবমাননা হওয়া। ২০২০-র মার্চে কবিগুরুর শৈলীতে বসন্ত উৎসব পালন করতে গিয়ে বাঙ্গালি অনুভব করেছে বিশ্বকবির লাঞ্ছিত হওয়া। এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে ধরে নিলে অতি সরলীকরণ হয়ে যাবে বই কী! আরও ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে যুক্ত আছে নবীন তরুণ প্রজন্ম।

কাদের চক্রে পড়ে এইসব নবীন তরুণ প্রজন্ম এরকম দিশাহীন হয়ে পড়ছেন? আর বারে বারে মহাপুরুষরাই বা কেন লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়ছে? সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি তাঁদের স্বার্থ বা সর্বস্ব ত্যাগ কি আজকের প্রজন্মের কাছে মূল্যহীন! আজকের প্রজন্মের চরিত্র গঠনের কাছে তাঁদের আদর্শ কি অন্তরায় হয়ে পড়েছে? এটা খুঁজে বের করতে হবে। দেখতে হবে আমাদের দায়বদ্ধতায় কোনো ঘাটতি নেইতো যা তরুণ নবীনদের এভাবে বেপথু করে দিচ্ছে!

এবারের চতুর্দিকে সারা বিশ্বচরাচরে এত 'করোনা' 'করোনা'-র চোখ রাঙানি... তার মধ্যেও তরুণ-তরুণীরা এরকম করবে সেটা কল্পনাতীত। আমরা সবাই ভালো মানুষের মুখোশ পরে নিত্য অভিনয় করে চলেছি। নিপুণ অভিনয়ে আমাদের অমানুষিক সত্তাকে ঢেকে দিচ্ছে সেটা যতই প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসতে চায় না কেন! কিন্তু অসতর্ক মুহূর্তে যখন মুখোশের খোলস ছাড়িয়ে আমাদের আসল মুখ বেরিয়ে পড়ে; সেটা প্রত্যক্ষ করেই হয়তো তরুণদল বিনা মুখোশে তাদের মুখটাকে বের করে ফেলেছে! সুতরাং শুধুমাত্র নবীন তরুণ দলকে দোষারোপ করে এই ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনা বন্ধ করা যাবে— সেটা এক প্রকার বাড়াবাড়ি বই কী! আমাদেরও আত্ম মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা নেই কি! সেই সঙ্গে রাজনীতির কারবারিরা হয়তোবা মুচকি হাসছে। কারণ বিদ্যালাগরের মূর্তির শহিদ হওয়া বা সাম্প্রতিককালের কবিগুরুর ধর্ষিত হওয়া— এই ঘটনাগুলোর পেছনে মাস্টারমাইন্ড কে, তা হয়তো কোনো কালেই প্রকাশ পাবে না! কিন্তু বলির পাঁঠা হবে ওইসব নিরীহরা! আর পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির কারবারিরা কবেই বা সততা মেনে রাজনীতি করেছে! ■

দিল্লির দাঙ্গায় কাদের উসকানি?

রাজু সরখেল

সম্প্রতি, দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে জিতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী আপের নেতা কেজরিওয়াল। বিজেপি ও কংগ্রেসকে হারিয়ে কেজরি দিল্লির গদিতে বসেন। জেতার পর পটকা বাজি আবির নাকাড়া বাজিয়ে ক্ষমতা জাহির করে বলেন, দিল্লিবাসীর জয়। আপের মুখপাত্রের বড়ো বড়ো ভাষণ শুনে মনে হচ্ছিল যেন বিশ্বজয় করে এসেছেন। যেন ধরাকে সরা জ্ঞান না করা। দিল্লির দাঙ্গায় মূল জঙ্গি, আপের কাউন্সিলর এবং হত্যালীলার নায়ক হাজি তাহির হুসেনের নির্দেশে বেশ কয়েকজন দিল্লিবাসীর মৃত্যু হলো, কিন্তু দিল্লি পুলিশের ক্ষমতা হলো না দাঙ্গা রোধ করা। মিডিয়ার ছানবিনে যে তথ্য উঠে এসেছে তাহলো এই দাঙ্গা প্রিপ্ল্যানড্। দাঙ্গার রসদ একদিনে জোগাড় করা সম্ভব নয়। আপের কাউন্সিলর তাহির হুসেনের উদ্দেশ্য একঢিলে দুই পাখি মারা— (১) সন্ত্রাস করে বিধানসভা জেতার জন্য রসদ জোগাড়। (২) আপের জেতার পর দিল্লিকে কাশ্মীর বানানোর চক্রান্ত। বিজেপি জিতলে এই দাঙ্গা সম্ভব নয় জেনে সংখ্যালঘু মুসলমানদের সমস্ত ভোট আপের পক্ষে যায়। উল্টোদিকে ভণ্ড কংগ্রেস, সিপিএমের নেতারা অমিত শাহের পদত্যাগ চাইছেন। এদের বুদ্ধি নাশ হয়েছে, বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি। দিল্লি থেকে হিন্দুদের উচ্ছেদ করার চক্রান্ত। রাজনীতি এখন হিংস্রদের আখড়া বা ঘাঁটি। দিল্লির দাঙ্গা করোনা ভাইরাসের চেয়ে ভয়ংকর ছিল। নির্ভয়া দোষীদের ফাঁসি হোক চেয়েছিল সমস্ত দেশবাসী, ঠিক তেমনি হাজি তাহির হুসেনের ফাঁসি হোক। ডিসিপি অঙ্কিত শর্মাকে ও রতনলালকে নৃশংসভাবে হত্যা করা, বহু সম্পত্তি পুড়িয়ে নষ্ট করা, ধর্ষণ করে মহিলাকে পুড়িয়ে দেওয়া— সবকিছুর মূল নায়ক তাহির হুসেন। এর ফাঁসি চেয়ে দলমত নির্বিশেষে সকলের রাস্তায় নামা উচিত। কোথায় বুদ্ধিজীবীর দল? কোথায় অবিজেপি দল?

উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনে তিনশোর বেশি আসন জিতে মসনদে বসে একের পর এক জনদরদি কাজ করছেন মোদী। কংগ্রেস ও বামপন্থীরা কল্পনা করতে পারেননি এত শর্ট টাইমে দেশের গরিবদের জন্য একের পর এক হাজারো প্রকল্পের ঘোষণা করতে পারবেন। যেমন— কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি, তিন তালাক রদ, নোট বন্দি, এয়ার স্ট্রাইক, আয়ুষ্মান ভারত, এক দেশ এক আইন, উজ্জ্বলা যোজনা, গরিবদের বিনামূল্যে শৌচালয়, গরিবদের আবাস যোজনা, এক দেশ এক রেশনকার্ড, সাধারণ জাতির দশ শতাংশ সংরক্ষণ, কৃষকদের জন্য কৃষিক্ষেত্রে বিমা ইত্যাদি হাজারো প্রকল্প।

উল্লেখ্য, বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহর মতে, 'মোদী নিজেকে যেভাবে তৈরি করেছে, যা রাহুল পারেনি। সেই কারণে মোদীকে পরাস্ত করা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব নয়'। এতদ্‌সত্ত্বেও, নিরলস মোদীজী, এসমস্ত জনকল্যাণমুখী কাজ করে আমজনতার মনে স্থান করে নিয়েছেন যা দেখে সমালোচক ও নিন্দুক নেতাদের মধ্যে আসাদুদ্দিন ওয়েসি, মণিশঙ্কর আইয়ার, ফারুক ও ওমর আবদুল্লা, মায়াবতী, অখিলেশ যাদব, রহুল ও সোনিয়া, অধীর চৌধুরী, মহম্মদ সেলিম, মমতা ব্যানার্জি, সীতারাম ইয়েচুরিরা জ্বলছেন। বাঙ্গলার লাল ও ডানের কবি সাহিত্যিক, কলাকুশলী আর বুদ্ধিজীবীদের একাংশ পথে নেমেছেন কেন্দ্রের এনআরসি ও সিএএ-এর বিরোধিতায়। এরা রোহিঙ্গা আর অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশীদের শরণার্থীর তকমা দিতেই আন্দোলন করছেন। এরা ডান ও বাম ছাত্র সংগঠনের ছাত্র নেতাদের লেলিয়ে দিয়ে মোদীর বিরোধিতায় কলকাতায় পথ অবরোধ করাচ্ছেন। প্রসঙ্গত, স্বাধীনতা আন্দোলনের যুব মহান নেতাদের নাম মুখে আনেন না। এঁদের প্রতিকৃতিতে মালা চড়ান না। এইভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে লাটে তুলে, পড়াশুনাকে লাটে উঠিয়ে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মগজ ধোলাই করে, তাদের পথে নামিয়ে রাজ্যপাল, মোদী, অমিতজীর বিরোধিতা করাচ্ছেন। আহা কী আদর্শ চিন্তাধারা! মরে যাই। বামপন্থীরা ভাবেন, ভারতকে মার্কস ও লেনিনের চিন্তাধারায় বিকশিত করবেন। বামপন্থীরাই দেশ চালাবেন। চীন, ভিয়েতনাম, কাম্পুচিয়ার ভাবধারা প্রতিষ্ঠা করবেন। রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজীর আদর্শে কোনো কালেই বিশ্বাসী ছিলেন না। ঐশী ঘোষ আর কানহাইয়া কুমারকে মাঠে নামিয়ে দেশ বিরোধী স্লোগানে উজ্জীবিত করছেন। এই ডান-বামদের একটাই স্লোগান 'মোদী হটাও দেশ বাঁচাও', পরোক্ষে চীনের ভাবধারাকে ভারতে প্রতিষ্ঠা কর। এসব নিয়ে রাজনীতি ডান বামের শিশুসুলভ চপলতা মাত্র।

সুতরাং, (১) মোদী দেশকে সুরক্ষা দিতে যা যা আইনি পদক্ষেপ নিয়েছেন তা একদম সঠিক। (২) তিনটি দেশ থেকে অত্যাচারিত হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈনদের ভারতে শরণার্থী চিহ্নিত করে নাগরিকত্ব দেওয়া। এই কাজগুলি করছে বলেই মোদী ও বিজেপি কি দেশদ্রোহী দল? বিরোধীরা মোদীর কাজগুলিকে দেশভাগের চক্রান্ত বলে মনে করছেন। সবশেষে বলব, অবিজেপি দলগুলি একটু চুপ থাকুন এবং মোদীজীর ওপর ভরসা রাখুন। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER CO.

74, Beliaghata Main Road. Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সবার প্রিয়

বিল্লদা®

চানাচুর

BILLADA CHANACHUR
KALIKAPUR, BOLPUR, BIRBHUM, WB
Tel.: 03463 252447, Mob.: 9434306796

ঐতিহ্যবাহী বেহালা রায়বাড়ির মাঠ জবরদখল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ঐতিহ্যবাহী বেহালা রায়বাড়ির মাঠ জবর দখল করল রাজনৈতিক মদতপুষ্ট একদল দুষ্কৃতী। অভিযোগ, বেহালা রায়বাহাদুর রোডের রায়বাড়ির প্রায় ২০ কঠোর এই মাঠ স্থানীয় ভাবে যেটি 'রায়নগর মাঠ' নামে পরিচিত। রায়পরিবার নানা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই মাঠ ব্যবহার করতে দেন। প্রতিদিন শিশুরা এই মাঠে ফুটবল খেলে ও শরীরচর্চাকরে। ইটকাঠ, কংক্রিটের জঙ্গলে এই মাঠ শিশুদের অক্সিজেন জোগায়। কিন্তু রায়বাড়ির অভিযোগ সম্পূর্ণ মালিকানা তাদের হাতে থাকা সত্ত্বেও কিছু দুষ্কৃতী স্থানীয় পুলিশ থানার সহায়তায় মাঠটি জবর দখল করে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে ফেলে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি। এমনকী ফুটবল খেলে যে শিশুরা তাদের বাড়িতে গিয়েও হুমকি দিয়ে আসা হয় যাতে শিশুরা মাঠে খেলতে না আসে। রায় পরিবার নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন, কারণ পুলিশ তাদের জি.ডি. নিতে থানা প্রত্যাখ্যান করেছে।

রায় পরিবারের অনুমতি ক্রমে দীর্ঘ ৩৫ বছর ওই মাঠ ব্যবহারকারী 'বেহালা মর্নিং ফুটবল কোচিং ক্যাম্প' প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে গত ২১ ফেব্রুয়ারি বেহালা থানায় একটি লিখিত আবেদন পেশ করে এবং জবরদখল রুখতে পুলিশের হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানানো হয়। তাদের অভিযোগে বলা হয়েছিল ওইদিনও (২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০), সকালে দুষ্কৃতীরা মাঠে চড়াও হয়ে বেআইনি নির্মাণ কাজ শুরু করার চেষ্টা করে। কিন্তু স্থানীয় লোকের কাছে বাধা পেয়ে আবার আসবে শাসিয়ে ফিরে যায়। বিষয়টি নিয়ে সকলে যে কোনো সময় শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করছিলেন। সেই আশঙ্কাকে সত্যে পরিণত করে ২৭ তারিখ সকালে পুলিশের প্রত্যক্ষ সহায়তায় মাঠটি দখল করা হয়। 'বাংলার বন্ধু' নামে একটি বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), ঠিকানা : ১১৮ ফকিরপাড়া রোড, পর্ণশ্রী থানা, কলকাতা-৭০০০৩৪। যেটির সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে সুজয় ভদ্র ও সমর ভূষণ সরকার, একটি ভুয়ো দলিলের সাহায্যে 7th Sub Judge আলিপুর আদালতের কাছ থেকে একটি Ex-parte order-এর ভিত্তিতে স্বর্গীয় শৌলেন্দ্রনাথ রায় এবং বর্তমান মালিক, তার দুই পুত্র সুবীর রায় ও গৌতম রায়ের ৭৭ বছরের মালিকানা অগ্রাহ্য করে, মালিকের অনুমতি প্রাপ্ত ৩৫ বছরের প্রতিষ্ঠিত একটি ফুটবল ক্লাবের সদস্যদের রাতারাতি পুলিশি সহায়তায় বহিঃস্কার করে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পাঁচিল দিয়ে দেওয়া হয়।

বেহালা রায়বাড়ি অমরেন্দ্র ভবনের বক্তব্য, ১৯৪৩ সালে স্বর্গীয় শৌলেন্দ্রনাথ রায় জমিটি ক্রয় করেন মহেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। জমিটি সিএস ৭১৩৯নং দাশ অর্থাৎ আর এস ১০২১০ ও ১০২১১ নং দাগের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৯০ সালে শৈলেন্দ্রনাথ রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীরা এই ভূমির অধিকারী হন।

প্রয়াত শ্রীরায় একজন সমাজসেবী এবং বেহালা সাউথ সুবারবান মিউনিসিপালিটির কমিশনার ও চেয়ারম্যান ছিলেন। সমাজসেবামূলক মনোভাবের জন্য তিনি ১৯৮৩ সাল থেকে মর্নিং ফুটবল কোচিং ক্যাম্পকে মাঠে প্রশিক্ষণ শিবির করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এছাড়া অন্য বহু সংস্থা এখানে বিভিন্ন কার্যক্রম করে সারাবছর ধরে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সংস্থা বেহালা নামযজ্ঞ সমিতি ৪২ বছর ধরে মাঠটি ব্যবহার করছে। 'বাঙ্গলার বন্ধু' নামক এনজিওটি মূল মালিক পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ না করে, কোনো সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন না করে কিছু সমাজ-বিরোধী ও দুষ্কৃতীর সাহায্যে প্রাশাসনিক ক্ষমতার অবব্যবহার করে, অন্যায় ভাবে জমি দখলের যে দৃষ্টান্ত রাখল তাতে পশ্চিমবঙ্গে জমিমাফিয়াদের আধিপত্য যে দৃঢ় ভাবে কায়েম হয়েছে তা আবার প্রমাণিত হলো।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজীর শহিদ মিনার ময়দান থেকে উদ্‌ঘোষ 'আর নয় অন্যায়'কে যদি যথার্থ বাস্তবায়িত করতে হয়, তাহলে রাজ্যের বর্তমান বিরোধী পক্ষ ভারতীয় জনতা পার্টিকে আরও সক্রিয়, সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে এবং সমাজের মানুষের অভাব অভিযোগের প্রতিবিধান করতে নির্দ্বিধায় এগিয়ে আসতে হবে।

শব্দরূপ-২ (বিষয় অভিমুখ—মহাভারত) **অরুণ কুমার ঘোড়ই**

১		২	৩	■	৪	৫	■
	■	৬		৭	■	৮	
৯	১০		■		■		■
১১		■	১২			■	১৩
	■	১৪			■	১৫	
■	১৬	■		■	১৭		
১৮		■	১৯	২০		■	
■	২১		■	২২			

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. পাণ্ডুর মাতা,
৪. অষ্ট গণদেবতা, যাঁরা শান্তনু গঙ্গার পুত্ররূপে জন্মেছিলেন,
৬. ছেদন...ভঞ্জন...নিরাকরণ,
৮. ভীমের হাতে নিহত রাক্ষস,
৯. সূর্য,
১১. শর,
১২. পরীক্ষিতের মাতা,
১৪. বালক কৃষ্ণের ক্রীড়া-সহচর,
১৫. সহ্য করা,
১৭. বিচিত্রবীর্যের পিতা,
১৮. চন্দ্রবংশীয় রাজা উশীনরের পুত্র,
১৯. তপস্বী,
২১. অম্বা-অম্বিকারা যে দেশের রাজকন্যা,
২২. ব্যাসদেবের ব্রহ্মচারী পুত্র।

উপর-নীচ : ১. পাণ্ডবদের বারো বছর বনবাস কালের পরের একবছর,
২. লিপিকরণ...লিখিত বিষয়,
৩. ব্যাপার...ঘটনা...গ্রন্থের ভাগ,
৫. শকুনির পিতা, ৭. নরশ্রেষ্ঠ,
১০. বাজি, হারলে যাহা দিতে হয়,
১২. অসংকীর্ণতা...ঔদার্য্য,
১৩. মহাজ্ঞানী...উদার স্বভাবের মানুষ,
১৫. সাধু, ১৬. বিদুরের স্ত্রী,
১৭. শাসন কর্তা,
২০. জন্তু।

(● আগামী সংখ্যায় সঠিক উত্তরদাতাদের নাম প্রকাশ করা হবে।)

প্রেরণার পাথেয়

সঙ্ঘ নতুন পতাকার সৃষ্টি করিতে চাহে না। সঙ্ঘ গৈরিক ধ্বজার সৃষ্টি করে নাই। সঙ্ঘ কেবল সেই পরম পবিত্র গৈরিক ধ্বজাকেই রাষ্ট্রীয় ধ্বজ হিসাবে স্বীকার করিয়াছে যাহা হাজার হাজার বছর ধরিয়া আমাদের রাষ্ট্র ও ধর্মের ধ্বজ ছিল। ভগবাধ্বজের পিছনে ইতিহাস ও পরম্পরা আছে। ইহা হিন্দু সংস্কৃতির দ্যোতক। হিন্দু ধর্ম, হিন্দু-সংস্কৃতি ও হিন্দু-রাষ্ট্রের রক্ষার জন্যই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সৃষ্টি হইয়াছে। সেজন্য যে বস্তুগুলি এই সংস্কৃতির প্রতীক, সঙ্ঘ সেই সমস্তকে রক্ষা করিবে। ভগবাধ্বজ হিন্দুধর্ম ও হিন্দুরাষ্ট্রের প্রতীক হওয়ার ফলে তাহাকে রাষ্ট্রধ্বজ হিসাবে গ্রহণ করা সঙ্ঘের কর্তব্য।

* * *

হিন্দু সমাজে জন্মগ্রহণ করিবার ফলে এই সংগঠনের দায়িত্ব আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তাহা প্রতিজ্ঞা পূর্বক পালন করিতে হইবে। এই দায়িত্ব প্রতিদিন বাড়িয়া যাইতেছে। আমাদের কার্যক্ষেত্রে খুব বিশাল। ইহা কোনো বিশেষ প্রদেশে বা গ্রামে সীমাবদ্ধ নহে। আসেতুহিমাচল অখিল ভারতবর্ষ আমাদের কার্যক্ষেত্র। আমাদের দৃষ্টিকোণ ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। সমস্ত ভারতবর্ষ আমার দেশ এই কল্পনা যেন আমাদের থাকে। আমরা কোন্ কাজ করিতে পারি এবং কতদূর করিতে পারি তাহা প্রথমে নিশ্চিত করিয়া সেই অনুসারে যেন আমরা আমাদের জীবনকে গঠিত করি।

* * *

যে সমস্ত বিদেশী লোকেরা হিন্দু সংস্কৃতিকে বিধ্বস্ত করিয়া হিন্দুদের চিরতরে পরাধীন করিবার জন্য হিন্দুস্থানে আসিয়াছিল এবং আজ এখানে বসবাস করিতেছে, তাহাদের ভীষণ আক্রমণ হইতে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিবার মতো মনোবৃত্তি সমস্ত সমাজে নির্মাণ করিয়া, সমাজকে সংগঠিত করার কাজ সঙ্ঘকে করিতে হইবে। এই কাজের জন্য সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিবার শিক্ষা এবং প্রয়োজন হইলে নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিবার মতো মনোবৃত্তি জাগাইতে হইবে।

* * *

সংস্কারের উপর সঙ্ঘের খুবই বিশ্বাস আছে। মানুষের আচরণ তাহাদের সংস্কারের অনুরূপই হয়। আমরা যেন হিন্দু সংগঠনের জন্য সংস্কার গ্রহণ করি এবং নিশ্চিতভাবে সেই কাজকে সুসম্পন্ন করি।

('ডাক্তারজীর বাণী' পুস্তিকা থেকে গৃহীত)